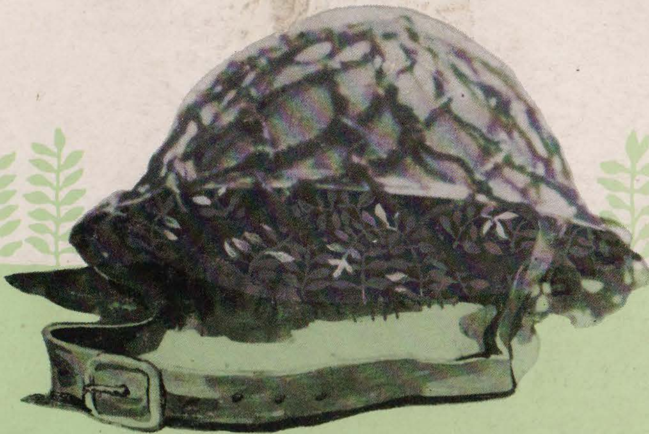
পাকিস্তান



একনায়কতন্ত্র ও সংকটের সরূপ

সম্পাদনা
হাসান গারদেজি
জামিল রশিদ

অনুবাদ
তানভীর মোকাম্মেল

সন্তোষ গুপ্তর ভূমিকা সম্বলিত

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই
দেশটি নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে।
বিভাগের পর
বহুল পরিমাণে মুসলমান জনসংখ্যা
ভারত থেকে এদেশে প্রবেশ করে।
সামরিক শাসনের মতো
একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে বারবার ঘাঁটি গেড়েছে।
এক প্রদেশ উন্নয়নে এগিয়ে গেলে
অন্য প্রদেশ করুণভাবে পিছিয়ে পড়েছে।
ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ
গোটা দেশের মেরুদণ্ডকে মোটেও শক্ত হতে দেয়নি।
যার ফলশ্রুতি—
সামাজিক মেরুকরণ।
এবং অবশ্যই, একাত্তরে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় রূপ পাওয়া,
বলা যায়,
অনেকটা এ সবকিছুর এক প্রতিবাদী বিস্ফোরণ।
এ বইয়ের তিন প্রবন্ধকার
পাকিস্তানের সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর অসমঞ্জস ও জটিল দিকগুলিকে
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন।
তৃতীয় বিশ্বের এক দেশে
সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের ভূমিকা চমৎকারভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।
উঠে এসেছে পরাশক্তির সঙ্গে
পাকিস্তানের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রকৃত স্বরূপ।
প্রবন্ধ লেখকদের সবাই-ই
দেশে ও বিদেশে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।
এঁদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ
আমাদের জন্যে অনেকখানি মূল্যবান।

৩২·০০ টাকা

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

পাকিস্তান



একনায়কতন্ত্র ও সংকটের স্বরূপ

পাকিস্তান একনায়কতন্ত্র ও সংকটের স্বরূপ

সম্পাদনা

হাসান গারদেজি
জামিল রশিদ

অনুবাদ

তানভীর মোকাম্মেল

সন্তোষ গুপ্তর ভূমিকা সম্বলিত

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ; ভাদ্র ১৩৯৩
অনুবাদের স্বত্ব ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬
প্রচ্ছদশিল্পী সমর মজুমদার

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেডক্রস বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পোঃ বক্স ২৬১১, ঢাকা ২, কর্তৃক প্রকাশিত এবং বর্ণমিছিল ৪২এ, কাজী আবদুর রউফ রোড ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত

ভুমিকা

রোমক সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস এ্যান্টোনিয়াস বলেছেন : "সর্বদাই বিষয়টি সামগ্রিকভাবে দেখবে। খুঁজে বের কর এর কোনটি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারপর সেটি উন্মোচন কর এবং এর কার্যকারণ, বক্তব্য বিষয়, উদ্দেশ্য খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ কর.

পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অথবা তারিক আলীর ভাষায় পুরানো পাকিস্তানের মৃত্যু এবং নতুন পাকিস্তানের অর্থাৎ সাবেক পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে পুনর্গঠিত করার পরবর্তী সময়ে এই রাষ্ট্রের চরিত্র, প্রকৃতি, নেতৃত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতির উপর বিভিন্ন লেখকের বিশ্লেষণধর্মী লেখাগুলো সম্পাদনা করে হাসান গারদেজি ও জামিল রশীদ একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থটির নাম পাকিস্তান দ্য রুটস্ অব ডিক্টেটরশীপ। বাংলায় বলা চলে পাকিস্তান : একনায়কতন্ত্রের উৎস। গ্রন্থটির সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটিতে পাকিস্তানকে কী পরিচয়ে অর্থাৎ এর কোন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন, তা গ্রন্থের উপনাম হিসেবেই উল্লেখ করেছেন : দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব এ প্রীটরিয়ান স্টেট অর্থাৎ আমলাশাসিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি। রোমের উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীদের বলা হত প্রীটর।

পাঁচটি অধ্যায়ে লিখিত এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়টির অনুবাদ করেছেন জনাব তানভীর মোকাম্মেল। গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে "পাকিস্তান : একনায়কতন্ত্র ও সঙ্কটের স্বরূপ"। মূলগ্রন্থে এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি লিখেছেন তিনজন পাকিস্তানী লেখক— হামজা আলাভী, এজাজ আহ্মদ এবং বিলাল হাশমী। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, হাসান গারদেজি ও জামিল রশীদ এই গ্রন্থের লেখকদের পরিচয় দিতে গিয়ে সংক্ষেপে ভূমিকায় জানিয়ে দিয়েছেন সহৃদয় পাঠককে— তরুণ পাকিস্তানী লেখক যারা এই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে পরিচিত এবং এদেশের শাসনে শোষণে বর্ধিত হয়েছেন,

তাদের লেখাই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এরা সবাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময়ে উভয়মুখী উদ্বাস্তু মিছিল, যুদ্ধ, আঞ্চলিক সংঘর্ষ এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বিদেশী হস্তক্ষেপ— দেশের সামরিক শাসন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে ওতপ্রোতভাবে পরিচিত।

গ্রন্থটির মুখ্য বিষয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ— তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সমাজ জীবন, শ্রেণী, সামরিক শাসন এবং বিশ্বরাজনীতিতে পাকিস্তানের অবস্থানের তাৎপর্য এবং দেশের মানুষের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব ও পরিণতি।

অনুবাদকৃত দ্বিতীয় অধ্যায়টি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের চারিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সামরিক সরকার পর্যন্ত সমগ্র কালটির ধারাবাহিকতা, সংক্ষিপ্ত বিচার-বিশেলষণ স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে। একজন পাঠক সমগ্র গ্রন্থটি না পড়েও পৃথকভাবে এই অংশটি একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পড়লে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মূল চরিত্র ও পরিণতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভাল ধারণা পাবেন।

গ্রন্থটির অনুবাদকৃত দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্যতম লেখক হামজা আলাভী "শ্রেণী ও রাষ্ট্র" এই শিরোনামে ঐতিহাসিক পটভূমি, একটি বহিরাগত শক্তি হিসেবে রাষ্ট্র, শ্রেণী গঠন ও শ্রেণী বিন্যাস, দেশীয় বুর্জোয়া ও শিল্প উন্নয়ন, মেট্রোপলিটন পুঁজির সাথে সম্পর্ক, ভূস্বামী শ্রেণীসমূহ, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের চরিত্র, বেসামরিক প্রশাসনের ভূমিকা, উন্নয়নের দশ-বছর ও কাঠামোগত ভাঙ্গন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এজাজ আহ্‌মদ লিখেছেন "গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব" প্রবন্ধ। এখানে তিনি অতি ডানপন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান, ভুট্টো ও পিপিপি'র পেছনের ইতি-হাস, '৭০ দশকের অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক সংকটসমূহের সংক্ষিপ্ত-সার, নিপীড়নের প্রকৃতিসমূহ ও জামাতসংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করে-ছেন। ভুট্টোর ফাঁসী দেওয়ার পর এজাজ আহ্‌মদ 'পুনশ্চ' দিয়ে তার লেখার তাড়াহুড়ার ফলে যে কিছু ভুল বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে তা এবং ভুট্টোর ফাঁসীর ঘটনাটি থেকে তিনি ভুট্টো সংক্রান্ত তার মূল্যায়ন কিঞ্চিৎ সংশোধন করেন এবং বিচার-বিশ্লেষণের রীতিনীতি সম্পর্কে আর কিছু সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

এই 'পুনশ্চ' অংশটির অনুবাদ এ গ্রন্থে স্থান পায় নি। কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে এই গ্রন্থের কোন কোন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির এই সংশোধনীটি চিন্তা-শীল পাঠককে অবহিত করতে পারত।

আগেই বলা হয়েছে যে, হাসান গারদেজি ও জামিল রশীদ সম্পাদিত "পাকিস্তান : দ্য রুটস্ অব ডিক্টেটরশীপ" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি যা "পাকিস্তান : একনায়কতন্ত্র ও সঙ্কটের স্বরূপ" নামে পৃথক একটি পুস্তক হিসেবে বাংলায় প্রকাশ করা হল, তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং তার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঠককে একটা মোটামোটি ধারণা দিবে। তাই এটি কার্যতঃ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থের অভাব পূরণে, সীমিত অর্থে হলেও, অনেকটা অবদান রাখবে।

একই সাথে একথাও বলা চলে, এই বাংলা বইটি পড়ার মধ্য দিয়ে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ অনগ্রসর দেশে একনায়কত্ব অর্থাৎ সামরিক একনায়কত্ব কিংবা সামরিক শক্তি আশ্রিত বে-সামরিক একনায়কত্বের স্বরূপ আর সঙ্কটের চেহারায় মৌল সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন দেশে তার বাহ্য প্রসাধনের পার্থক্যটুকু ভৌগলিক ও সামরিক অবস্থান, ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা, সামাজিক রীতিনীতি এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ প্রদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। চরিত্র গুণগতভাবে একই, বৈচিত্র্য পরিমাণগতভাবে পৃথক সত্তা বহন করে মাত্র।

সামরিক শাসনাধীনে দেশে বা যে সব দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়ে থাকে সে সব দেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের নামে গণঅংশগ্রহণের পদক্ষেপ ও বৈধকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বকে গণতন্ত্রের গবাক্ষ হিসেবে গণ্য করা হলেও সামরিক শাসন কোনরূপ সুফল বহন করতে পারেনি, এ অভিমত প্রগতিবাদী অর্থনীতিবিদগণ দেখিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থে এ বিষয়টি পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

"১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এই দশকে তৃতীয় বিশ্বের ৭৭টি স্বাধীন দেশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে রবার্ট জ্যাকস্যান বলেন, 'সংক্ষেপে অর্থনীতিক উন্নয়-নের মাত্রা কিংবা ভৌগলিক অঞ্চল নির্বিশেষে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ সামাজিক পরিবর্তনে কোন অনন্য ফল (ইউনিক এফেক্ট) রাখতে পারে না।'"

পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসনের পক্ষে যুক্তি হিসেবে রাজনীতিকদের অক্ষমতা, রাজনৈতিক শূন্যতা, তাদের দুর্নীতি ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, রাজনীতিকরা তাদের কার্যকলাপের জন্য জনগণ ধিকৃত। সামরিক শাসকদের এই যুক্তি নতুন নয়। যদিও তৎকালে আমাদের নিকট কথাটা নতুন মনে হয়েছিল, অর্থাৎ একটা নতুন কথা আমরা শুনেছিলাম সামরিক শাসন জারীর সপক্ষে।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ফ্রাঙ্কম্যান চার্চ গঠিত চার্চ কমিশনের সামনে গভর্নর রকফেলার লাতিন আমেরিকার সামরিক একনায়কতন্ত্র শাসিত কয়েকটি দেশ সফর করে এসে সেখানে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের সুপারিশ কেন তিনি করলেন তার ব্যাখ্যা দেন। এই কমিশনে যখন তিনি সাক্ষ্য দেন, তখন ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের 'কমিউনিষ্ট আগ্রাসন' থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গণতন্ত্র রক্ষায় ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের অধীনে পাঁচলাখ সৈন্য নামিয়েছে।

চার্চ কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে রকফেলারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সায়গন সরকারকে সামরিক ভাবে সহায়তা করছে, সেখানে দোরের কাছে লাতিন আমেরিকার সামরিক স্বৈরশাসকদের আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন সুপারিশ করেছেন। জবাবে রকফেলার বলেছিলেন, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে রাজনৈতিক শূন্যতা, দুর্নীতি ও দুর্বল প্রশাসনহেতু যেখানে সামরিক সরকার কায়েম করা হয়েছে একথা সামরিক একনায়কগণ বলছেন।

ফ্র্যাঙ্কম্যান জবাবে বলেন, আমার বেশ মনে আছে শৈশবকালে তখনও রাজনীতিতে প্রবেশ করিনি, তখন ইউরোপে ফ্যাসিষ্টরা রাজনৈতিক দল উৎখাত করে ক্ষমতাদখলের পক্ষে একই যুক্তি দিয়েছিল। সুতরাং কোন সামরিক শাসকই রাজনীতি, অর্থনীতি দুর্নীতি ও প্রশাসন সম্পর্কে নতুন কথা বলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে এশিয়া ও আফ্রিকায় সামরিক স্বৈরশাসকরা অবশ্য কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের কথা বলে থাকেন। ফ্যাসিস্টদের সাথে তাদের এই বাহ্যিক পার্থক্যটুকু এসব দেশে জনসাধারণের ঔপনিবেশবাদী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য হেতু বজায় রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের অন্য কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে কিছুটা পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একটি উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামরত দেশকে বিভক্ত করে একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ রাষ্ট্রটির ভূসংস্থানগত অবিচ্ছিন্নতা ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রে নয়, ধর্মীয় উপাদান মুখ্য ছিল— ইসরায়েল রাষ্ট্রের সাথে এই বাহ্য মিল ছাড়া আর কোন সাদৃশ্য নেই এক্ষেত্রে। সর্বশেষ, প্রথমাবধি রাষ্ট্রের প্রশাসনে আমলা ও সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য এবং পরবর্তী সময়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বগ্রহণ। তাদের এই জনবিচ্ছিন্ন চরিত্রকে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামরিক আমলা শাসকদের মধ্যে সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করার ঝোঁক থেকে হামজা আলাভী রাষ্ট্রশক্তিকে বহিরাগত শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, "শুধুমাত্র নিম্নবর্গের শ্রেণীগুলিকেই রাষ্ট্রকে একটা বাইরের শক্তি হিসেবে মোকাবেলা করতে হয় না। অর্থনৈতিকভাবে নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগুলিকেও কখনও কখনও রাষ্ট্রের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।" রাষ্ট্রের এই অতিবর্ধন বা "আপেক্ষিক স্বাধীনতা"র পক্ষে যুক্তি হিসেবে উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক পুঁজির ফলে কাঠামোগত পরিবর্তনহেতু মেট্রোপলিটন বুর্জোয়া, দেশীয় বুর্জোয়া ও ভূস্বামী শ্রেণীর সহাবস্থানহেতু প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের বিভিন্ন ঝোঁক ও চাহিদা রাষ্ট্র ও এ সব শ্রেণী মিটিয়ে থাকে— একথাও উল্লেখ করেছেন হামজা আলাভী।

মূলতঃ বর্তমানে নয়া মার্ক্সীয় অর্থনীতিবিদগণ অনগ্রসর দেশসমূহের অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীলদেশগুলো একদা যারা বিদেশী উপনিবেশ ছিল— তাদের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে আসছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির লেখকদিগকে মোটামুটি তাদের শ্রেণীতে গণ্য করা যেতে পারে। এরা অর্থনীতির বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় দেন এবং তারই আলোকে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে প্রচেষ্টা চালান। আন্তর্জাতিক বাজার, বহুজাতিক কর্পোরেশনের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান এদের বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই তথ্যগত সম্যক জ্ঞান থেকেই তাদের নয়া মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব এরা দাঁড় করিয়েছেন। এদের মধ্যে যারা চরমপন্থী বলে পরিচিত তারা উন্নত অর্থনীতি ও অনুন্নত অর্থনীতিকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মনে করে থাকেন। এদের তথ্যনির্ভর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত বিশ্লেষাত্মক তত্ত্ব এখনও কোন সর্বজনগ্রাহ্য রূপ পায় নি।

আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন লেখা থেকে মনোযোগী পাঠক এটা উদ্ধার করতে পারবেন।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সামাজিক ভিত্তি, শ্রেণী চরিত্র এবং দেশের ভিতরে শ্রেণীসমূহের বিন্যাস ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (ইন্টার একশন) সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহের ব্যাখ্যা তথা বিশ্লিষ্ট করার পদ্ধতি এক কথায় অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ব্যাখ্যা দৃশ্যত: নয়া মার্ক্সীয় আলোকে উপস্থাপনের বিষয়টি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। অনেক মার্ক্সীয় অর্থনীতিবিদ যারা ক্লাসিকাল অর্থে মার্ক্সবাদী বলে অভিহিত নন, তারাও এদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করেছেন।

লেখক হামজা আলাভী "রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা" বলতে সামরিক আমলার শাসন, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কীভাবে কখনও দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার উল্লেখ করেছেন উদাহরণ হিসেবে। নিকারাগুয়াতে সোমোজা পরিবার ৬০ শতাংশ সম্পদের মালিক ছিলেন। দেশীয় বুর্জোয়া এমনকি ভূস্বামীদের একটি অংশ সোমোজা বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। তারপর অবশ্য অনেকে সোমোজার উৎখাতের পর সমাজ পরিবর্তনের কর্মসূচীর বিরোধিতা করে বর্তমানে বিদ্রোহী শিবিরে অবস্থান নিয়েছেন। এটাকে কি রাষ্ট্রের অতিবর্ধন বলা হবে কিংবা 'রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা' বললেই এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ স্পষ্ট হবে? উন্নত বিশ্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইইসি ভুক্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং জাপানের বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এ ধরনের পরিভাষাগত শব্দ চয়ন বা নির্মাণ দিয়ে করা সম্ভব, না, নয়া মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার আলোকে বুর্জোয়া শ্রেণী তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখলে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কার্যকারণকে বোঝাতে সাহায্য করবে? চিন্তাশীল পাঠকদের মধ্যে অবশ্যই এসব প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে। নয়া মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় মূলধনের প্রকৃতগত পার্থক্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'পাকিস্তান: একনায়কতন্ত্র ও সঙ্কটের স্বরূপ' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। আছে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের নৈকট্য ও নিরাপত্তার অনুভূতি সামরিক শাসনের গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ সমূহে। তাই অনগ্রসর অর্থনীতির ব্যাখ্যায় বিশ্ব বাজারে বিনিময় সম্পর্কের উপর জোর পড়েছে, ক্লাসিক্যাল মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্কের উপর নয়। বাণিজ্যে

নিযুক্ত মূলধন ও শিল্প মূলধনের মধ্যে পার্থক্যের স্পষ্টতা মার্কস-এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন। বাণিজ্যে নিযুক্ত মূলধন শিল্পে নিযুক্ত মূলধনে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় ধনিকশ্রেণী— যাদের প্রগতিমুখী বলে (অনগ্রসর দেশে) চিত্রিত করা হয়; তদের উদ্ভব সম্ভব নয়। অনগ্রসর অর্থনীতিতে বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিযুক্ত দেশসমূহের পক্ষে এই বাধা তো আরও প্রবল। রপ্তানীমুখী দেশগুলোর দারিদ্র্যের নিঃসীম অন্ধকার মাথাপ্রতি বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত উচ্চহারের প্রসাধনের ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে।

কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে সেই আড়ালটুকু নেই। অবশ্যই আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে। অনগ্রসর অর্থনীতিসম্পন্ন তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশ কতখানি সম্ভব? নয়া মার্ক্সীয় অর্থনীতির প্রবক্তা টমাস ভাইসকফ এই মত পোষণ করেন যে, অনগ্রসর দেশগুলোর পক্ষে এ ধরনের ধনিক শ্রেণীর বিকাশ অসম্ভব। তিনি এক কথায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই চরম মতটির বোধ হয় অপর পিঠে অনগ্রসরশীল দেশের 'অধনতান্ত্রিক বিকাশে'র পক্ষে জনৈক সোভিয়েত অর্থনীতিবিদের একটি তত্ত্ব রয়েছে। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিগতই নয় তত্ত্বগতও। শেষোক্তটিতে উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-এর প্রসঙ্গটি এসেছে, ভাইসকফ তেমন কোন রাষ্ট্রযন্ত্র-এর কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর কোন মতটিই এযাবৎ সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তবে শেষোক্তটি বিজ্ঞানসম্মত।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের আরও একটি দিক আছে। তা হল ভৌগলিক অবস্থানের বিচ্ছিন্নতা এবং কৃষিজ কাঁচামালের উৎস হিসেবে বাংলাদেশকে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) উপনিবেশতুল্য গণ্য করে শোষণের প্রক্রিয়াটি। তাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তান টিকতে পারবে কিনা এ প্রশ্ন নতুন করে দেখা দেয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনুবাদক মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী, শ্রেণী ও সমাজ সংক্রান্ত সংজ্ঞা তিনি জানেন। অথচ 'সোশ্যাল বেস এর' স্থানে তিনি 'শ্রেণী ভিত্তি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাংলা গ্রন্থের সূচনা বাক্যটিতেই এটা চোখে পড়েছে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কোন কোন অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ করতে যেয়ে অর্থগত বিভ্রান্তি কিংবা অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছেন। 'পাকিস্তানের শ্রেণী

গঠন ও শ্রেণী বিন্যাস' উপশিরোনামে তৃতীয় অনুচ্ছেদে যেখানে মূলগ্রন্থে বলা হয়েছে সেচ এলাকায় সর্বনিম্ন ৫ একর জমিতে সম্পূরক আয় ব্যতীত একটি পরিবার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সেই অংশটি বাদ দিয়ে বর্গাদার কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির বর্ণনায় তিনি সহসা চলে গেছেন। ফলে কৃষকদের দুরবস্থার চিত্রটির তথ্যগত দিকটি অস্পষ্ট-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কৃষকদের শ্রেণী বিন্যাসের বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত-ভাবে দেওয়া হয়েছে।

এজাজ আহ্‌মদ-এর 'একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র' এর 'পুনশ্চ' অংশে ভুট্টোর ফাঁসির পর লেখক তার পূর্ববর্তী লেখার কিছু বক্তব্য সংশোধন করেছেন। পিপিপি'র নেতা ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী জনাব জেড, এ, ভুট্টো মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। সুতরাং তাঁর ফাঁসীর পর লেখক মনে করলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের নিকট নতি স্বীকারের একটা মাত্রা পর্যন্ত ভুট্টো গিয়েছিলেন, তার বেশী এগোতে চান নি। সুতরাং নতি স্বীকারে একটা সীমা আছে এবং ভুট্টো-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটা ভুট্টো-চরিত্রের কোন অনন্য দিক নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত বন্ধু অনেক শাসকই শেষ পর্যন্ত তাদেরই কুনজরে পড়েছেন, তাদের অপরাধ একটাই—মৃদু অবাধ্যতা কিংবা তাদের চরিত্র এমন নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়েছে যে 'গণতান্ত্রিক' বিশ্বে আমেরিকার মুখ দেখান ভার হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিগ মিনের সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাত পেন্টাগণ পেপার্স-এ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট দিয়েমকে দিয়ে কাজ চালানো অসম্ভব এবং অবিরাম যুদ্ধে-ক্লান্ত দিয়েম কোন শান্তি আলোচনা সম্ভব কি না এরকম একটা মনোভাব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য দিয়েম, ভ্রাতৃদ্বয় সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলে মাদাম ন্যু তিক্তকন্ঠে বলেছিলেন "আমেরিকা যার মিত্র, তার আর শত্রুর প্রয়োজন হয় না।" ভুট্টো-চরিত্রের কোন অনন্য দিক নয়, সাম্রাজবাদী স্বার্থান্ধ-চরিত্রই ভুট্টোর ফাঁসির কারণ।

পাকিস্তানের অস্তিত্বকাল থেকে তার শাসকদের চরিত্র, শ্রেণীগত অবস্থান এবং রাষ্ট্রগত চরিত্র-এর উপর এই বাংলা গ্রন্থখানি শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামরিক শাসনের চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে না, উপরন্তু তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ও সাবেক উপনিবেশ হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় রাখার জন্য সামরিক শাসন কিংবা সামরিক শক্তি আশ্রিত

গোত্রান্তর প্রাপ্ত শাসকশ্রেণী এক নয়। রাষ্ট্রপ্রশাসনে এক নয়। ব্যবস্থার জন্য দিয়েছে। মেট্রোপলিটান রাষ্ট্রের প্রভাববলয়ে প্রান্তীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে এদের ভূমিকা হৃদয়ঙ্গমে গ্রন্থখানি সহায়ক হবে। পাঠকগণ স্বীয় অবস্থার বিশ্লেষণ ও আত্মপ্রকৃতির বিশ্লেষণের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে যতদূর দেখতে সক্ষম হবেন, এ গ্রন্থের সার্থকতা ততদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সর্বোপরি, 'পাকিস্তান একনায়কতন্ত্র ও সঙ্কটের স্বরূপ' পুস্তকটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। তৃতীয় বিশ্বের এক সর্বজনীন সমস্যার বিশ্লেষণে ইতিহাস চেতনা, বাজারের টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক চরিত্রের গতি ও প্রকৃতির সম্পর্ক, নয়া মার্ক্সীয় অর্থনীতিবিদ, প্রগতিবাদী রাজনৈতিক চিন্তাশীল লেখকদের অভিমতের আলোকে এদেশের প্রগতিবাদী ধ্যানধারণার বাহক মননশীল ব্যক্তিবর্গ তাদের চিন্তা ও চেতনার ধারাকে শাণিত করার সুযোগ পাবেন। 'ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের একটি মূল্যবান গ্রন্থ দেশবাসীকে উপহার দিয়ে পাকিস্তানের প্রগতিবাদী মননশীলতার সাথে এদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সাযুজ্য উপলব্ধির এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে।

আমাদের স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থটির অবদান পাঠকগণকে আকৃষ্ট করবে। আমাদের আত্মসমীক্ষার আয়োজনকে সমৃদ্ধ করতে গ্রন্থখানির সহায়ক ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

সন্তোষ গুপ্ত

অনুবাদকের কথা

বক্তব্যের স্বচ্ছতা ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে আক্ষরিক অনুবাদ এড়ানো হয়েছে, তবে তা করা হয়েছে মূলের প্রতি অনুগত থেকেই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ (term) ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুবাদ সম্পূর্ণভাবে মূলানুগ করা হয়েছে। প্রয়োজন মনে হওয়া বিধায় অনেক পদের মূল ইংরেজী শব্দটি বন্ধনীর মাঝে রেখে দেওয়া হলো। বইটির আকার ও মূল্য পাঠকদের নাগালের মধ্যে রাখার লক্ষ্যে খুব প্রয়োজনীয় নয় এমন কিছু লাইন ও অংশ বর্জন করেছি, তবে শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি এড়াতে ও মূল রচনার যৌক্তিক কাঠামো যাতে কিছুমাত্র খণ্ডিত না হয়, সে ব্যাপারে সযত্ন দৃষ্টি রেখেই তা করা হয়েছে। বইটি অনুবাদ করে তৃপ্তি পেয়েছি এবং আরো বেশী করে পেয়েছি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের জনাব মহীউদ্দীন আহ্‌মেদ এবং তাঁর তরুণ সহকর্মী মাহবুব হাসানের উৎসাহ ও সহযোগিতায়। বইটির কিছু কিছু প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়েছে। সেই দিক থেকে এ বইটি বাঙালী পাঠকদের কাছে যদি কোনো নতুন চিন্তার খোরাক কিছুমাত্র যোগাতে পারে, তবেই পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করব।

১ অক্টোবর, ১৯৮৬ — তানভীর মোকাম্মেল

সূচী

হামজা আলাভী

পাকিস্তান : শ্রেণী ও রাষ্ট্র*

পাকিস্তানে আজ যে সামরিক সরকার বজায় রয়েছে, এধরনের সামরিক সরকারের শ্রেণীভিত্তি কি? পাকিস্তানের, তথা উপনিবেশোত্তর কালে যেসব দেশে সামরিক শাসনের জের বেড়েই চলেছে, সে সব দেশের সমাজের শ্রেণী-কাঠামোতে কি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে? প্রশ্নটা অন্যভাবেও করা যায়। পাকিস্তানে সামরিক শাসনের হাত থেকে বিভিন্ন সময়ে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতার হাত-বদল, বা, তার বিপরীতটা ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলো থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্ত টানব যে প্রতিটি ভিন্ন ধরনের সরকারের পরিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের শ্রেণীভিত্তিতে কোনো বড় রকম পরিবর্তন হয়েছে? বা প্রতিটি পরিবর্তনই ছিল পুরোনো "শাসকশ্রেণী"কে সরিয়ে আরেকটি "শাসকশ্রেণী"-কে ক্ষমতায় বসানো? তবে যদি আমরা তার শ্রেণী-ভিত্তি থেকে রাষ্ট্রের "আপেক্ষিক স্বাধীনতা"-র ধারণাটি মেনে নিই, তা'হলে সমস্যাটাকে আমরা ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে এবং বিভিন্ন সরকারের পরিবর্তনের কারণের জটিলতাগুলো অনুধাবনে অগ্রসর হতে পারি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

পাকিস্তানের ইতিহাস এধরনের কিছু মূল তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও সেসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর খোঁজার একটা ভালো উদাহরণ হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা বিষয়টিকে একটা সুনির্দিষ্ট সমস্যার নিরিখে যাচাই করতে চাই, আর তা' হচ্ছে "ক্ষমতার হাতবদলের ধারা", যে বিষয়টিকে রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় জটিল করে ফেলা

*হামজা আলাভী রচিত "দি স্টেট ইন ক্রাইসিস", ২য় খণ্ডের "ক্লাশ এণ্ড স্টেট" প্রবন্ধ। —অনুবাদক।

হয়েছে। তবে বিষয়টি আমরা পাকিস্তানের শ্রেণীভিত্তি ও কর্তৃত্বশালী শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণের আলোকেই দেখব, এবং বিশেষ করে, সামরিক বাহিনী বা আমলাতন্ত্রের মত শ্রেণী ও গ্রুপের (যাদের শ্রেণী-অবস্থান নির্ধারণ বহু জটিল প্রশ্নের উদ্ভব ঘটায়) মধ্যেকার দ্বন্দ্বের আলোকেই তা' দেখব।

যদিও পাকিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের একটা ভড়ং দেখানো হয়েছে, তবু বাস্তবে শুধুমাত্র ৭০-দশকে পাকিস্তান পিপল্স পার্টি-র (পিপিপি) সরকারের মেয়াদটাই ছিল একটিমাত্র ব্যতিক্রম। তাও সাধারণ নির্বাচনের অনুপস্থিতির কারণে এ সরকারকেও পার্লামেন্টারী "গণতন্ত্র" বলে সঠিকভাবে আখ্যায়িত করা হয়তো যায় না। পাকিস্তানের প্রথম দশকেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হলো, অবশ্য মাত্র নয় মাসের জন্যে, যখন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পার্লামেন্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং দেশ শাসন করার জন্যে আমলা, সেনাবাহিনীর অফিসার, ভূ-স্বামী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা "সর্বধরনের প্রতিভার মন্ত্রীসভা" গঠন করলেন। কিন্তু এক বেসামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা সৃষ্ট এই সরকার নিজেকে বৈধ করতে ব্যর্থ হলো এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। তবে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল ভিন্ন ধাঁচের। কারণ তা' করাই হয়েছিল সামরিক শাসন জারী করে। তবে আমরা পরে দেখাতে চেষ্টা করব যে এ সরকারেরও চরিত্র মূলতঃ ছিল বেসামরিক। আইনসিদ্ধ হওয়ার জন্য পাকিস্তানের সমাজকে এই শাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে বাঁধবার জন্য এই সরকারের একটা বেসামরিক "গণভিত্তি"র প্রয়োজন পড়ল যা "মৌলিক গণতন্ত্র" প্রথার জন্ম দিল। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বেসামরিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রূপ পাওয়ায় সামরিক আইন তুলে ফেলা হলো। আইয়ুব খান একটা রাজনৈতিক দলের নেতা হলেন এবং তার সরকারের একটা পার্টি-রাজনীতির চরিত্র ছিল।

কিন্তু বেসামরিক মন্ত্রীদের নিয়োগ সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খানের সরকারের চরিত্র ছিল পুরোপুরিই সামরিক। সেদিক থেকে পাকিস্তানের প্রথম দশকের অন্যান্য পার্লামেন্টারী সরকারের তুলনায় পিপিপি-ই ছিল জনগণের রায় পাওয়া ও একটা পার্টির (ও তার নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টোর) কার্যকর নেতৃত্বের এক সরকার। আমরা পরে দেখাব যে পিপিপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানে আগেও বহু রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতা ক্ষমতায় বসলেও মূল ক্ষমতাটা কিন্তু রয়ে গিয়েছিল

সামরিক-বেসামরিক অলিগার্কির হাতে।[১] পিপিপি সরকার আমলাতন্ত্রের মূল কোষ সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সি এস পি) প্রথা ভেঙ্গে দিলে আমলাতান্ত্রিক শক্তি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনী ১৯৭৭ সালে পিপিপি সরকারের পতন ঘটানোয় নেতৃত্ব দেয় এবং জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তানের প্রথম পুরোদস্তুর সামরিক সরকার কায়েম হয়। সে যে ক্ষমতায় রয়েই যেতে চায় সে সম্পর্কে তার ইঙ্গিত পরিষ্কার (যতদিন না পাকিস্তানে একটা "ইসলামী" অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম না হচ্ছে, আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে সে সময়সীমা অনন্তকালও হতে পারে)। অতীতের সামরিক সরকারগুলো থেকে বর্তমানের এই সামরিক সরকারের একটা বড় পার্থক্য এই যে, অতীতের সব সামরিক সরকারই একটা রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় ক্ষমতায় এসেছিল এবং অবস্থা স্থিতিকরণ, বেসামরিক প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ ও নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের ভূমিকাকে কিছুটা খাটো করে দেখাতে ও রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে "বৈধ" রাখতে চেয়েছিল।

পাকিস্তানের পরবর্তীকালের সরকারসমূহের চরিত্র ও ভূমিকা বুঝতে হলে আমাদেরকে রাষ্ট্রের "আপেক্ষিক স্বাধীনতা" বলতে আসলে কি বোঝায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং যে রকম ভাবে পাকিস্তানে রাষ্ট্র ও বেসামরিক সমাজ (civil society) এক সঙ্গে মিলেছে, সে সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা অর্জন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর সামাজিক চরিত্র (রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের অবস্থান), এবং শাসকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিম্নবর্গের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের উল্লেখসহ তাদের শ্রেণী "উৎস", শ্রেণী "সম্পর্ক" ও শ্রেণীগত "দায়" সমূহের পরিপূর্ণ মূল্যায়নও প্রয়োজন। তাছাড়া যদি এটা ধরে নেওয়া হয় যে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগুলির তুলনায় সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করে, সে ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ ও লক্ষ্যসমূহের যে সীমাবদ্ধতা আছে, সে বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

একটা বহিরাগত শক্তি হিসেবে রাষ্ট্র

আমরা এই সহজ সত্যটা ধরে অগ্রসর হতে পারি যে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশসমূহে, যেমন পাকিস্তানে, রাষ্ট্র ক্ষমতা কর্তৃক ক্রমশঃই স্বৈরতন্ত্রী ও সামরিক একনায়কতন্ত্র জন্ম দেওয়ার ঝোঁকটাই বেশী প্রধান। শুধুমাত্র নিম্নবর্গের শ্রেণীগুলিকেই রাষ্ট্রকে একটা বাইরের শক্তি হিসেবে মোকাবেলা

করতে হয় না। অর্থনৈতিকভাবে নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগুলিকেও কখনও কখনও রাষ্ট্রের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাষ্ট্র তাদের মূল স্বার্থ ঠিকই দেখেছে বটে, তবুও রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রই কখনও কখনও তাদের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে রাষ্ট্র যেমন একটা একক নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছে এবং ওই শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ীই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে, নয়া-উপনিবেশবাদের প্রভাবাধীন প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশসমূহে কিন্তু অবস্থাটা সে রকম নয়। এখানে আমরা দেখি যে অর্থনৈতিকভাবে নেতৃস্থানীয় শ্রেণী-গুলির, বিশেষ করে, দেশীয় বুর্জোয়াদের উপরে রাষ্ট্র অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং এই রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর এই শ্রেণী-গুলির "প্রত্যক্ষ" নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমি অতীতে এই লক্ষণকে "অতি-বর্ধিত রাষ্ট্র"[২] (overdeveloped state) হিসেবে উল্লেখ করেছি এই অর্থে যে, রাষ্ট্র যে অনুন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থ ও যে নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাচ্ছে, সেই দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার চেয়েও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও শক্তি অনেক বেশী বর্ধিত হয়ে পড়েছে।

আমি এই যুক্তি দেখিয়েছি যে, পাকিস্তানের মত অনুন্নত পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রের এই আপেক্ষিক স্বাধীনতার "অতি-বর্ধন (overdevelopment) ও সমাজ-জীবনে কর্তৃত্বশালী ভূমিকার অবস্থান, এ সমাজের অর্থনৈতিকভাবে নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগুলি, যথা, মেট্রোপলিটন পুঁজি (Metropolitan capital),* দেশীয় বুর্জোয়া ও ভূ-স্বামী শ্রেণীগুলির বহুত্ববাদীতার (pluralism) সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এ সব শ্রেণীর পারস্পরিক স্বার্থ ও দাবীর সংঘাতে রাষ্ট্র মধ্যস্থতা করে থাকে। এসব শ্রেণীর উপর রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে. এমনকি এদের মধ্যে সবচে' শক্তিশালী যে মেট্রোপলিটন পুঁজি (যার পক্ষে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ রয়েছে), যারা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রটি তাদের উপর ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে খুবই নির্ভরশীল, তারাও কিন্তু রাষ্ট্রের এই আপেক্ষিক স্বাধীনতাকে হাল্কাভাবে নিতে পারে না এবং উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদেরকেও "সমঝোতা"-য় আসতে হয়। পাকিস্তানের

---

*যেহেতু Metropolitan Capitalism-এর কোনো সর্বজনস্বীকৃত বাংলা প্রতিশব্দ এখনও গৃহীত হয়নি, তাই আমরা সহজবোধ্যতার স্বার্থে "মেট্রোপলিটন" শব্দটাই ব্যবহার করছি। —অনুবাদক

উদাহরণ তার প্রমাণ। এমনকি তারাও মাঝে মাঝে তাদের সব দাবী পূরণ করিয়ে নিতে সক্ষম হয় না। উপনিবেশ যুগে বা পরনির্ভরশীলতা সম্পর্কে যে রকম মাঝে মাঝে স্থূলভাবে বলে দেয়া হয়,সেরকম এককভাবে কিন্তু এখন আর তারা তাদের দাবী উপনিবেশোত্তর-রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না।

তবে উপনিবেশোত্তর-রাষ্ট্রকে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের নির্দেশিকা ও সীমা-বদ্ধতার মধ্যেই কাজ করতে হয়। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী যে তিনটি শ্রেণী নিয়ে শাসকশ্রেণীটা গঠিত, তাদের যৌথ স্বার্থ একে দেখতে হয়। একটা বিষয় এখানে কিছুটা পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। এটা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম একটা মূল বিষয় যে, ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির (বা সমাজ-ব্যবস্থা) সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী-গুলির স্বার্থের মধ্যে একটা মৌলিক ও বৈরী "দ্বন্দ্ব" রয়ে গেছে এবং সেটাই ইতিহাসের মূল বিষয়। সেকারণেই উদাহরণস্বরূপ গত শতকের শেষ দিকে রুশ সামন্ত-সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেণীগুলি সামন্তবাদী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল এবং ফলে সে সময় রুশ দেশের বিপ্লবের স্তর হয়েছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (Bourgeois-democratic revolution)।

ঔপনিবেশিক সমাজের ক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া হোত যে দেশীয় বুর্জোয়া যা ক্রমে "জাতীয় বুর্জোয়া"-য় পরিণত হয়, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের, ও ভূ-স্বামী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব বাঁধে। কিন্তু এই ধারণায়, ঔপনিবেশিক পুঁজির ফলে যে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে, যার কারণে অর্থনৈতিকভাবে তিনটি প্রধান শ্রেণী, মেট্রোপলিটন বুর্জোয়া (Metropolitan bourgeois), দেশীয় বুর্জোয়া ও ভূ-স্বামী শ্রেণী যে একসাথে সহাবস্থান করতে পারে, এই বিষয়টা হিসাবে রাখা হয় না। বিষয়টা আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না, কারণ তা' আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা[৩] ও এর তত্ত্বগত[৪] দিক নিয়ে এর আগে অন্যত্র আলোচনা করেছি। ওইসব বিশ্লেষণে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এ তিনটি শ্রেণীই উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রে নিজেরা একই কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত হয় এবং একটা শক্তিজোট হিসেবে গড়ে ওঠে। উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র ও এইসব শ্রেণীকে তাই প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের (peripheral capitalism) বিভিন্ন ঝোঁক ও চাহিদা মিটিয়ে চলতে হয়।

রাষ্ট্রের ব্যাপারে "আপেক্ষিক স্বাধীনতা"-র প্রসঙ্গটির বিষয়ে আমি বলতে চাই যে রাষ্ট্র শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী শ্রেণীর দাবী ও

চাহিদা অনুযায়ীই কাজ করে না।[৫] বস্তুতঃ উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রযন্ত্রটা হচ্ছে অনুন্নত পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত নীতি অনুযায়ী তা' পরিচালনার একটা মাধ্যম বিশেষ। যারা এই রাষ্ট্রযন্ত্রটা চালিয়ে থাকে, রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের এইসব নীতি ও যুক্তিকে প্রতি পদক্ষেপেই মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র যদিও সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীগুলির দাবীর প্রতি সাড়া দেয়, তবুও প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী অর্থনীতিটা পরিচালনার ক্ষেত্রে সে স্বাধীনভাবেও একটা হিসাব কষে। প্রান্তস্থ পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রের নীতির ক্ষেত্রে কখনও কখনও হিসেবে গরমিল ঘটতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, রাষ্ট্রের উপরে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের দাবীই নিয়ামক হয়। পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকারের কার্যকলাপ ও দেশে একটা ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাদের যে উদ্দেশ্য তা পুরোপুরি বুঝতে এই বিষয়টি খেয়ালে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তানে শ্রেণী-গঠন ও শ্রেণী-বিন্যাস

এটা সবাই জানেন যে বর্তমানে যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত ১৯৪৭-র স্বাধীনতার আগে শিল্প-পুঁজি এসব অঞ্চলে খুব সামান্যই বিকশিত হয়েছিল। বড় আকারের শিল্প হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি ছিল, যেমন, করাচীর ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, লায়ালপুরের (বর্তমানে ফয়সলাবাদ) স্যার শ্রীরামের কটন মিল ও মর্দানের প্রিমিয়ার চিনি কল। এগুলোর মালিক ছিল হিন্দু যাদেরকে দেশ ভাগের সময় দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এ অঞ্চলে শিল্পখাতে বিদেশী পুঁজিও তেমন বিনিয়োজিত হয়নি। আর যেটুকু হয়েছিল সেটাও দেশীয় পুঁজির মতই ব্যবসা, লগ্নি ও শিপিং এবং যৎসামান্য পরিমাণ খনির ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। সে সময়কার সবচে' বড় শিল্প ছিল লাহোরের মোগলপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ যা ছিল সরকারী খাতে।

পাকিস্তানের অর্থনীতির বড় অংশটাই নিয়ন্ত্রণ করত ভূ-স্বামীরা, যারা আবার দেশ বিভাগের ফলে হিন্দু ব্যবসায়ীরা চলে যাওয়ার ফলে জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে পণ্য সরবরাহের কাজটাও গ্রহণ করে ফেলে। ক্রমশঃ তারা তুলা, ময়দার কল, ধান মাড়ানো ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রেও নিজেদেরকে ছড়িয়ে দেয়। গ্রামীন অর্থনীতিকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। পরে কিছু বড় ভূ-স্বামী বড় আকারের শিল্পের ক্ষেত্রেও নিজেদের নিয়োজিত করে।

অসম্পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে গ্রামীন শ্রেণী কাঠামোর বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক ক্ষমতা সম্পর্কে একেবারে নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট কিছু বলা মুশকিল। ১৯৭২ সালে কৃষি জরীপ অনুযায়ী ২% কৃষি খামারের পরিমাণ দেশের মোট কৃষি জমির ২৪%। এর মধ্যে ৯% ক্ষুদ্রতম খামারের জমির পরিমাণের মোট জমির পরিমাণের সোয়া ১%-এর বেশী নয়। (১০০ একরের ওপর জমি রয়েছে মোট জমির মাঝে তার পরিমাণ ২৮%। এটাও মনে হয় যে জমির কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে কমিয়ে বলা, কারণ, ভূমি-সংস্কারের ভয়ে বড় জোতের মালিকরা তাদের জমির সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে সত্য কথা বলে না।) অন্যদিকে, জরীপ দেখাচ্ছে যে ৭৬%খামারের (১২·৫ একরের কম আয়তনের) জমির পরিমাণ মোট জমির ২৪%-এর কম। বস্তুতঃ গ্রামীন অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরিই মুষ্টিমেয় কিছু ভূ-স্বামীর কর্তৃত্বে।

"মধ্যস্তরের কৃষক", নিজেদের জমি যারা নিজেরা চাষ করে, এই শ্রেণীটির সংখ্যা বেশী নয়। যাদের জমির পরিমাণ খুবই কম, তারা বাড়তি আয়ের ব্যাপারে, বিশেষ করে ফসল কাটার সময়টাতে, ভূ-স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল। তাদের এই অর্থনৈতিক নির্ভরতা রাজনৈতিক আনুগত্য ও নির্ভরতায় পরিণত হয়। বড় জোতের মালিকেরা, অর্থাৎ যাদের ১৫ থেকে ২০ একরের বেশী জমি রয়েছে, তারা আগে জমি বর্গা দিত। ষাট ও সত্তরের দশকে কৃষিতে ব্যাপক যন্ত্রায়নের ফলে ব্যাপক সংখ্যক বর্গাচাষীই তাদের পেশা হারিয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সার্বক্ষণিক ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অংশটাই বর্তমানে কৃষির সঙ্গে আংশিকভাবে, বিশেষ করে ফসল কাটার মৌসুমটাতে জড়িত কিম্বা শহরে গিয়ে কারখানা বা গৃহনির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।

বার্কীর মত কেউ কেউ এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্গাচাষীদের যারা নিয়োজিত করত সেই "সামন্ত শ্রেণীকে"-কে হঠিয়ে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটা "মধ্যবিত্ত কৃষক", কৃষি-পুঁজিপতি শ্রেণীর উন্মেষ ঘটেছে।[৬] তাঁর মতে এই "মধ্যবিত্ত" পুঁজিপতি কৃষকরা হচ্ছে তারা যারা ৫০ থেকে ১০০ একরের মত জমির মালিক। বার্কী আইয়ুবের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে, যাকে একটা "বিপ্লব" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, এই শ্রেণীকে সম্পর্কিত করেতে চেয়েছেন। কিন্তু ভুল পরিসংখ্যান ও খোঁড়া যুক্তির কারণে তাঁর বক্তব্য ভিত্তিহীন বলেই গণ্য হচ্ছে।[৭]

যদিও গত দুই দশকে পাকিস্তানের কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তবুও বড় ভূ-স্বামীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত: আগের মতই রয়ে গেছে। একের পর এক ভূমি-সংস্কার কখনো গোড়ায় টান দিতে পারেনি। কয়েকশত একর জমির মালিক ভূ-স্বামীদের উপদলীয় কোন্দলের ভিত্তিতেই মূলতঃ গ্রামীন সমাজের রাজনৈতিক শক্তি নির্ভরশীল। তারা তাদের উপর নির্ভরশীল বর্গাচাষী, ক্ষেতমজুর এবং আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের নিজেদের পক্ষে পেয়ে থাকে। তারা "মধ্যবিত্ত কৃষক"-দেরও দলে টানে, কখনও কখনও স্রেফ ভয় দেখিয়েই। এমনকি ৭০-এর নির্বাচনেও, ভিন্ন রকম প্রচার থাকলেও, গ্রামাঞ্চলে পিপিপি-র সাফল্য মূলতঃ ছিল শক্তিশালী স্থানীয় ভূ-স্বামীদের সঙ্গে সখ্যতার ফল, যদিও এটাও সত্য যে পিপিপি-র জনপ্রিয়মূলক বক্তৃতা ও প্রতিশ্রুতিসমূহে গ্রামীন সম্প্রদায়ের একটা অংশের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল ও পিপিপি-কে তারা ভোট দিয়েছিল। এইভাবে ভূ-স্বামীদের প্রতিনিধিত্ব মূলতঃ সব রাজনৈতিক দলেই রয়ে গেছে। অবশ্য রাষ্ট্রে তাদের শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলসমূহে তাদের অবস্থানের উপরই নির্ভরশীল' নয়। সবচেয়ে যেটা বড় ব্যাপার তা' হচ্ছে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র মূলতঃ এই শ্রেণী থেকেই আগত। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারই এসব আমলা-দের জমি প্রদান করে এসেছে। ফলে ভূ-স্বামী শ্রেণীটি রাষ্ট্রযন্ত্রে ভাল-ভাবেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে।

ভূ-স্বামীদের তুলনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকি-স্তানের দেশীয় বুর্জোয়ারা সব সময়ই অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। স্বাধীনতার আগে এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য মূলতঃ ছিল হিন্দুদের হাতে যাদেরকে পরে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাদের জায়গাটা ভারত, বার্মা ও পূর্ব-আফ্রিকা থেকে আগত মুসলমান ব্যবসায়ীরা দখল করে। এদের মধ্যে এক ব্যাপক অংশ ছিল গুজরাটি-ভাষী ব্যবসায়ী, উর্দু ভাষী রাজনৈতিক নেতা, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ এবং মূলতঃ নগদ অর্থ ঘুষ প্রদানের ওপরই তা' নির্ভরশীল ছিল। এ ছাড়া আরেকটি অংশ ছিল যারা প্রথমাবস্থায় ছিল অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত কিন্তু বর্তমানে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এরা হচ্ছে পাঞ্জাবী এবং উত্তর-ভারত থেকে আগত উর্দু-ভাষী ব্যবসায়ী। যে সমাজে ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ এখনও বিদ্যমান, যা ভূ-স্বামী হওয়া বা আমলাতন্ত্রের একটা উঁচুপদ থাকাকে ব্যবসা-

যাঁদের চেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করে, এমন এক সমাজে, আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্টতর সম্পর্ক থাকার কারণে গুজরাটিদের চেয়ে তারা কিছুটা ভালো অবস্থানে ছিল।

দেশীয় বুর্জোয়া ও শিল্প-উন্নয়ন

এটা উল্লেখযোগ্য যে, বুর্জোয়ারা খুব দুর্বল থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় নীতি শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে চালিত হয় এবং এ ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সকল প্রকার সমর্থন ও সাহায্য যোগানো হয়। রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী শ্রেণীর পছন্দের ব্যাপারটার ওপরই যদি আমরা বেশী জোর দেই, তাহলে পরের দিকের কথা না হয় বাদই দিলাম, ৫০-এর দশকেও যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, তা' ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ব্যাখ্যাটা একটা মতাদর্শগত বিষয়ে নিহিত। আর তা' হচ্ছে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় প্রচারিত এই বিষয়টি যে ভারত টিঁকে যাবে, কিন্তু পাকিস্তান একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিঁকবে না—কারণ, এর কোনো শিল্পভিত্তি নেই এবং অর্থনীতি টিঁকে থাকার মত মজবুত নয়। কয়েক দশক ধরে শক্তভাবে ধরে রাখা "অবিভাজ্য" ভারতের ধারণা ছেড়ে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব যে রাতারাতি দেশবিভাগকে মেনে নিল তার পক্ষে এই যুক্তিটাই দেখানো হতো তা, এ যুক্তির যোগ্যতা যাই-ই হোক্ না কেন। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র এই উভয় নেতৃত্বই জানত যে এটা অত্যন্ত অনিবার্য্য সত্য। পাকিস্তান ষ্টেস্ট ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে নতুন রাষ্ট্রটির এই সমস্যাটির কথা আমার মনে পড়ে যে, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায়ে, রাষ্ট্রের উপর স্ব-আরোপিত এই দায়িত্বটা নিয়ে তখন অনেক আলোচনা হতো এবং সবচে' বড় দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল যে অতীতের ঔপনিবেশিক বণিক বুর্জোয়া (mercantile bourgeoisie) রাষ্ট্রের ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে খুবই মন্থর ছিল।

"সামন্ত" শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান সরকার (যেটা একটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা) দেশীয় বণিক-পুঁজিকে শিল্প-পুঁজিতে পরিণত করার জন্য দ্রুত পথ ও পদ্ধতি খোঁজা শুরু করে। সরকারের পরামর্শ ও প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ব্যবসায় দ্রুত মুনাফা অর্জনের যে সুযোগ রয়েছে তা' ছেড়ে শিল্পে বিনিয়োগের যে দীর্ঘস্থায়ী ও অনিশ্চিত ধরন তাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ তারা দেখায়নি। তাই এই ব্যাপারে

সরকারের তখনকার দৃঢ় ভূমিকাকে বুর্জোয়াদের যে শ্রেণীটির অস্তিত্বই তখনও ছিল না, তাদের দাবীর প্রতিফলন বলা যায় না। স্বাধীনতার পর-পরই নতুন রাষ্ট্রটির অন্যতম প্রধান কাজ হলো এক শিল্প-বিষয়ক সম্মেলন আহ্বান করা। ব্যবসায়ীদের নানা রকম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় এবং নানাভাবে তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বস্তুত, সে তুলনায় পাল্টা উৎসাহের পরিমাণ ছিল বেশ কম।

ব্যবসায়ীদের দিক থেকে উৎসাহের এই স্বল্পতার কারণে ১৯৪৯ সালে দেশীয় বণিক-পুঁজি কেন শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশে অনিচ্ছুক তা' পরীক্ষার জন্য একটি "বিনিয়োগ তদন্ত কমিটি"(Investment Enquiry Committee) গঠন করা হয়। এমনকি ১৯৫৩ সালেও, যখন শিল্পে বিনিয়োগ মোটামুটি শুরু হয়েছে, তখনও আমরা রাষ্ট্রের উদ্বেগের প্রতিফলন অর্থমন্ত্রীর ভাষ্যে পাই যিনি দেখি শিল্পের উন্নয়নের জন্য শুল্কের ক্ষেত্রে আরো বেশী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দিচ্ছেন ও বলছেন যে, শিল্পে বিনিয়োগের অনীহা "আমাদের জাতীয় চরিত্রের এক বড় সমস্যা"। ১৯৪৯ সালে অবশ্য শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রথমত: রাষ্ট্র "পাকিস্তান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন" গঠন করে, যা পরে "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান"-এ পরিণত হয়। ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা, বিশ্বব্যাঙ্কের সমর্থন ও ব্যক্তি-পুঁজির অংশগ্রহণের দ্বারা পাকিস্তানের মূল বিনিয়োগের ব্যাঙ্ক "পাকিস্তান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দ্বিতীয়ত: ১৯৪৯ সালে মার্কিন ডলারের বিপরীতে পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস করা হয়। বহু দেশের মুদ্রা, বিশেষ করে স্টার্লিং এলাকার মুদ্রাও (ভারতীয় রুপী যার অন্যতম) তা' অনুসরণ করে। কিন্তু পাকিস্তান তার রুপীর মূল্য হ্রাস না করে ডলারের সঙ্গে সমতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ফলে পাউণ্ড-স্টার্লিং ও অন্যান্য যেসব মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে পাকিস্তানী মুদ্রা উল্লেখযোগ্য বিনিময় সুবিধা লাভ করে (শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ছাড়া, পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য তখন লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্ক সমূহের মাধ্যমে পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হতো)। পাকিস্তানের মুদ্রামান উঁচুতে থেকে যাওয়ার ফলে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য (যার মধ্যে শিল্প-উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও রয়েছে) কম হয় এবং পাকিস্তান থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য, যার অধিকাংশই মূলত: ছিল কৃষিজাত

পণ্য, বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশীয় বণিক পুঁজির হাতে বেশ ভালো অঙ্কের কাঁচা টাকা এসে জমা হয় এবং একটা নতুন শিল্প-বুর্জোয়া পাকিস্তানে বণিক পুঁজি বিকাশের পথে পা বাড়ায়।

এ সময় এ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণের প্রশ্নে সরকারের ভেতরে এক দ্বন্দ্ব চলছিল। বাণিজ্য মন্ত্রী ফজলুর রহমান, যিনি বাণিজ্য সচিবের দ্বারা ভীষণ-ভাবে প্রভাবিত ছিলেন, (বাণিজ্য সচিব স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকফারকুহার ছিলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগের অবশেষ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থের প্রতিনিধি) আমদানীর ক্ষেত্রে একটা "ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের" (Open General Licence) নীতি গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এটা নিঃস-ন্দেহে সম্ভাবনাময় দেশীয় উৎপাদনকারীদের উৎসাহ দেয়ার নীতিকে খর্ব করত। এর বিরুদ্ধে এবং জায়মান বুর্জোয়াদের পক্ষে অর্থমন্ত্রী গুলাম মুহম্মদ ও স্টেট ব্যাঙ্কের গভর্ণর জাহিদ হোসেন দাঁড়ান এবং স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক এমন সব পদক্ষেপ নেয়া হয় যার লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে প্রতিহত করা। কোরিয়ার যুদ্ধের রমরমা অবস্থার শেষে পাকিস্তান যখন বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে একটা গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী সঙ্কটে পড়ল তখনই বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি হলো। কারণ তখন বাণিজ্য-মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আর একটা উদারনৈতিক আমদানী-নীতি গ্রহণের কথা তোলা সম্ভব ছিল না। তখন থেকে সম্ভাব্য শিল্পপতিরা বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে একটা সুনিশ্চিত সংরক্ষণ পাওয়া শুরু করল এবং তাদেরকে আর সরকারের অনিশ্চিত খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভরশীল না থাকলেও চলত।

বণিক বুর্জোয়া যে শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে এই খোশ-খবরে সরকারও দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করতে এল। ১৯৫২ সাল থেকে রাষ্ট্রের-উদ্যোগে সৃষ্ট "পাকিস্তান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পো-রেশন" (পি আই ডি সি) কাজ শুরু করে। এর তিন সদস্য-বিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলীতে পাকিস্তানের সবচে' বড় ব্যবসায়ী পরিবারের একজন সদস্য ছিল। পি আই ডি সি-র প্রধান ছিলেন একজন সিনিয়র আমলা, গোলাম ফারুক, যিনি নিজেই শীঘ্রই দেশের একজন প্রধান শিল্পপতি হিসেবে আবির্ভূত হলেন। পি আই ডি সি কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়, যেগুলিকে পরে আবার ব্যক্তি-মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়। ব্যক্তি পুঁজির সঙ্গে মিলে পি আই ডি সি কয়েকটা যৌথ উদ্যোগও নেয়। এছাড়া কারিগরী তথ্য ও পরামর্শ এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা ও তার সুবিধা-অসুবিধা যাচাই

করে দিয়ে পি আই ডি সি উদ্যোগী ব্যক্তিদের শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এইভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যাপকভাবে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে জায়মান বুর্জোয়া মধ্য-পঞ্চাশের দশকে তার যাত্রা শুরু করে এবং ষাটের দশকে, আইয়ুব খান মঞ্চে আসার পর থেকে, খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই এগিয়ে চলে।

অবশ্য পাকিস্তানের শিল্প-পুঁজি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হলেও তাকে আমলাতন্ত্রের নানা রকম বাধা পেরিয়েই বিকশিত হতে হয়েছে। এই সব আমলাতান্ত্রিক বাধা-নিষেধের অনেকগুলিরই উৎস ব্রিটিশ আমল থেকেই, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সঙ্গতকারণেই ভারতবর্ষের দেশীয় শিল্প পুঁজির বিকাশকে 'নিয়ন্ত্রণ' করতে চাইত। কিন্তু স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানে এসব বিধি-নিষিধের তেমন কোনো প্রয়োজন না থাকলেও আমরা বাস্তবে দেখি যে এ সব বিধি-নিষেধকে শুধুমাত্র রেখে দেয়াই হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে বাড়ানোও হয়েছে। বস্তুত: আইন কানুনের নিয়ন্ত্রণ এতই ব্যাপক ও জটিল হয়ে উঠল যে সে ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের তথ্য প্রদান করা ও পারমিট-লাইসেন্স গ্রহণের নানা রকম বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে তাদের বের হওয়ার পথ দেখানোর জন্য সরকারকে একটা "ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন ব্যুরো" (Investment Information Bureau) স্থাপন করতে হয়। এর ফলে ব্যক্তি পুঁজিপতি তথা গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপরই আমলাতন্ত্র তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার সুযোগ পায়। অবশ্য এই সত্যটা থেকেই যায় যে রাষ্ট্রকে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের নিয়ম-নীতি মেনেই চলতে হতো। যারা শ্রেণী ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে খুব সহজ করে দেখেন তারা রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বশালী শ্রেণীর সম্পর্কের মধ্যেও যে মাঝে মাঝে আপাত স্ববিরোধিতা দেখা দেয়, সেই প্রকৃত দ্বান্দ্বিক সত্যটা বুঝে উঠতে পারেন না। রাষ্ট্রের শক্ত নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার স্ববিরোধিতা ও দ্বন্দ্বকে বুঝতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজনীয়।

আমলাতন্ত্রের ওপর বুর্জোয়াদের এই নির্ভরশীলতার কারণে আমলাতন্ত্র ব্যাপক পরিমাণে ঘুষ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যা অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপনের পরও তাদের জন্যে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ সৃষ্টি করে। এই অর্থ দিয়ে তারা শুধু জমি বা সম্পত্তি কেনে না, কোনো ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলিতভাবে, কিম্বা, স্ত্রী বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের নামে ব্যবসাতেও খাটায়। তাই এটা কোনো আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় যে আমলাতন্ত্র বা সামরিক বাহিনীর

উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ থাকার কারণে কিছু পরিবার দেশের বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বুর্জোয়াদের আগ্রহ কিছুটা বাড়লেও তা' রাষ্ট্রের উপরে আমলাতন্ত্রের প্রভাব খর্ব করার মত যথেষ্ট ছিল না। অবশ্য আইয়ুব খানের সময়ে এ ব্যাপারে কিছু পরির্তন লক্ষ্য করা যায়, যে আইয়ুব খানের নিজের পরিবারও দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বনে বসেছিল।

আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের আরেক ধরনের প্রভাবের দিক রয়েছে। তা' হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যবসায়ীরাই আমলাতন্ত্রের উপর মহলে প্রবেশ ও তা থেকে সুযোগ আদায় করে নিতে পারে। এর ফলে ধনী ও পুরো-দস্তুর বিবেকবোধ-বর্জিত ব্যবসায়ীরাই অপেক্ষাকৃত কম ধনী ও "সৎ" ব্যবসায়ীদের থেকে বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়, স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা ক্রমশঃ প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে থাকে এবং সম্পদ ধনী ব্যবসায়ী-দের কুক্ষিগত হয়। ধনী পুঁজিপতিরা শুধুমাত্র তাদের অধিক ধন-সম্পদের কারণেই নয়; রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সেখানে তাদের ভূমিকার কারণেও অপেক্ষাকৃত কম ধনী ব্যবসায়ীদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। পাকিস্তানে যে পর্বত-প্রমাণ ধনবৈষম্য, যার কথা পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এটা তার অন্য-তম কারণ। ১৯৬৮ সালের মাঝে আমরা দেখি যে দেশের মোট শিল্পপুঁজির শতকরা ৬৬ ভাগ মাত্র ২২টি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

ভারতের বুর্জোয়ারা যেরকম কংগ্রেস পার্টির মধ্যে নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে পেরেছিল, পাকিস্তানের বুর্জোয়ারা তেমন, কোনো একক রাজনৈতিক দলের ভেতর তাদের শক্তিকে সংহত করতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলো ভূ-স্বামীদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। বুর্জোয়াদের শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা মূলতঃ আমলাতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক ও লেন-দেনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই সম্পর্কের কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছিল না, কারণ, বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীর দাবী-দাওয়ার সমর্থনে কোনো রাজনৈতিক শক্তি জড়ো করতে সক্ষম ছিল না। আমলাতন্ত্র বুর্জোয়াদের শুধুমাত্র সেইসব দাবী-দাওয়ার প্রতিই কর্ণপাত করত যেগুলো কোন না কোনোভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজে আসছে। ফলে ১৯৭০ সালে পিপিপি-র উত্থান ও ভূট্টোর ক্ষমতায় আরোহণের পর আমলাতন্ত্র যখন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, তখন দেশীয় বুর্জোয়ারা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে যে রকম সাঁই সাঁই বৃদ্ধি ঘটেছিল সে তুলনায় ১৯৭০-এর দশকে এসে পাকিস্তানের জায়মান বুর্জোয়ারা একটা বড় আঘাত খেল। বিভিন্ন প্রকল্প বাতিল করার ফলে, বিশেষ করে ব্যক্তি-পুঁজির বিনিয়োগের মাত্রা ভীষনভাবে কমে যায়। এ সময়টাতে পাকিস্তানের হতোদ্যম বুর্জোয়াদের প্রতি ঘরে-বাইরে থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয়। হতোদ্যমের একটা কারণ শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গীপনার বিকাশ যা সে সময় পিপিপি উৎসাহিত করেছিল, অন্ততঃ সে রকম মনে হয়েছিল। পিপিপি-র জাতীয়করণ কর্মসূচী বুর্জোয়াদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এ কর্মসূচী ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু এতেই পাকিস্তানের বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গেল, কারণ ভারতের বুর্জোয়াদের তুলনায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক দুর্বলতর।

বুর্জোয়াদের আত্মবিশ্বাস পিপিপি সরকারের বাস্তব পদক্ষেপসমূহের জন্য ততটা নষ্ট হয়নি, যতটা হয়েছে জনাব ভুট্টো ও তার সরকারের খেয়ালখুশি মাফিক অনিশ্চিত ব্যবহারে। ওরা ভয় পাচ্ছিল যে আরো ক্ষতিকর কিছু ঘটতে পারে। ১৯৭৩ সালেয় সেপ্টেম্বরে ভুট্টো সরকার কর্তৃক সব্জী ঘি শিল্প জাতীয়করণ করাতে তাদের আশঙ্কা আরো দৃঢ় হোল কারণ এর আগে জনাব ভুট্টো আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জাতীয়করণ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে এবং আর নতুন করে কোনো শিল্প জাতীয়করণ করা হবে না। এসব কারণেই দেখি যে বুর্জোয়ারা জনাব ভুট্টোর কথা ও আশ্বাসসমূহের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে এবং অন্য কোনো বিকল্প খুঁজে পেলে দেশের ভেতরে আর পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহী হচ্ছে না।

অবশ্য ১৯৭০-এর দশকে শিল্পখাতে ব্যক্তি-পুঁজি কমে যাওয়ার ব্যাপারটাতে আমাদেরকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টাও হিসেবে রাখতে হবে। পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ, বিশেষ করে সূতীবস্ত্রের বাজার পড়ে যায় এবং অন্যদিকে মূল আমদানীপণ্য, এবং বিশেষ করে, জ্বালানীর দাম আকাশছোঁয়া হয়। পাকিস্তানের ভেতরে বিনিয়োগে মুনাফার বিষয়টি যখন অনিশ্চিত, তখনই পশ্চিম এশিয়ায় তেলের ব্যাপক বিকাশের ব্যাপারটি নতুন মুনাফার সুযোগ এনে দিল। ফলে পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের পারস্য উপসাগরের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকল এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কমে এল।

ওদিকে ভুট্টো সরকারও বুর্জোয়াদের প্রতি তার নীতি পাল্টাতে শুরু করে। প্রথমদিকে সে শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গীপনা উস্কে দিয়ে তা' থেকে রাজনৈতিক

ফায়দা ওঠাতে চাইলেও, এ সময়ে সে আবার নির্মমভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে শুরু করে এবং বুর্জোয়াদের মন জয় করার চেষ্টা করে। ১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৫-৭৬-এর বাজেটে ভুট্টো সরকার বুর্জোয়াদের প্রতি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। সরকার পুনরায় প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে আর জাতীয়করণ করবে না। পিপিপি-র জঙ্গী কর্মীবাহিনীর উপর তার নিজের সরকারই নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। "মার্কসবাদী" মন্ত্রীদের পদচ্যুত করা হয়। তাদের পদ গ্রহণ করে দেশের সবচে' জঘন্য কিছু প্রতিক্রিয়াশীলেরা। এর ফলে বুর্জোয়াদের মন জয় করা বা তাদের সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুবিধা হয়নি, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে যে পিপিপি-র নীতিমালা এতখানি পুঁজিবাদ-বিরোধী ছিল, সেই পিপিপি-ই কি করে আবার পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হলো? এই বিপরীত আচরণের ব্যাপারটা আসলে কি?

ভুট্টোর হঠাৎ করে এই নীতি-পরিবর্তনের কারণটা কি? আসলে, যেহেতু প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী এক দেশে বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু করা কিম্বা সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের পথ বেছে নিতে পি পি পি যোগ্য বা ইচ্ছুক ছিল না, সেইহেতু পুঁজিবাদী সমাজের হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার কোনো বিকল্পও ছিল না। এটা লক্ষ্য করার মতো যে এই মত-পরিবর্তন বুর্জোয়াদের ইচ্ছাপ্রকাশ বা চাপের কারণে ঘটেনি। কারণ, ততদিনে বুর্জোয়ারা সরকারের আবেদনের ব্যাপারে প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। চাপটা এসেছিল পদ্ধতিটার ভেতর থেকেই। হয় এ পদ্ধতি ছেঁটে ফেলতে হবে কিম্বা একে চালিয়ে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে কোনো নির্ধারক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে পশ্চাদপসরণ ছাড়া পি পি পি সরকারের সামনে আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। বাম শক্তিসমূহের ঐক্য ও কার্যকরী সংগঠন এবং বিদ্যমান সমাজ-কাঠামো রক্ষায় রাষ্ট্রের ভেতরকার শক্তিসমূহকে নস্যাৎ করা ছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো নির্ধারক পদক্ষেপই সফল হতে পারত না।

পি পি পি র আমলে সরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে "সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া"-র পথে একটা বড় পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয়। শিল্পে ব্যক্তিখাতের তুলনায় রাষ্ট্রীয় খাতে বিনিয়োগ পি পি পি সরকারের আমলে বেশী ঘটেছিল বলে মনে হয়। তবে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কালে এ ধরনের পরিসংখ্যান ভুল প্রমাণিত হতে পারে, আর সে কারণেই আরো মনো-

যোগ দিয়ে তা' পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নীচের সারণিতে তাই আমরা এ সময়টাতে ব্যক্তিখাতে ও সরকারী খাতে বিনিয়োগের হিসেবটা তুলে ধরছি।

সারণি ৩.১

পাকিস্তানে শিল্পখাতে ব্যক্তি ও সরকারী বিনিয়োগ

(দশ লক্ষ রুপীর হিসেবে)

	ব্যক্তি খাত		সরকারী খাত	
	বর্তমান মূল্যে	১৯৫৯-৬০ সালের স্থির মূল্যে	বর্তমান মূল্যে	১৯৫৯-৬০ সালের স্থির মূল্যে
১৯৫৯-৬০ —	১০২০.০	১০২.০০	২০০.০	২০০.০
১৯৬৯-৭০ —	১২২৫.৫	৮৩৯.৩৮	১৮৭.৭	১২৮.৫৬
১৯৭০-৭১ —	১২২৪.০	৮০৬.৩২	৬৮.২	৪৪.৯২
১৯৭১-৭২ —	১০১৬.০	৬৩৪. ৬	৭৮.৫	৪৯.০৩
১৯৭২-৭৩ —	৭০৮.০	৩৯১.৩৭	২৪৯.৫	১৩৭.৯২
১৯৭৩-৭৪ —	৬৪৫.৩	২৮৩.০২	৬২৪.০	২৩৭.৬৮
১৯৭৪-৭৫ —	৯৮২.০	৩৭৩.৬৬	১৬৫৪.০	৬৩০.৮৯

উৎস : "পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে'," পাকিস্তান সরকার, ১৯৭৫-৭৬'।

১৯৫৯-৬০ সালের স্থির মূল্য "বিনিয়োগে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসকৃত মূল্য তালিকা"থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে বড় ও মাঝারি আকারের শিল্পসমূহ।

৩.২ সারণিতে আমরা পরবর্তী বছরসমূহে বর্তমান মূল্যে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় খাতের আপেক্ষিক অনুপাত তুলে ধরছি।

সারণি ৩.২

বর্তমান মূল্যে শিল্পে বিনিয়োগ

	ব্যক্তি-খাত		সরকারী খাত	
	(দশ লক্ষ রুপীতে)	মোট অর্থের শতকরা হিসাব	(দশ লক্ষ রুপীতে)	মোট অর্থের শতকরা হিসেবে
১৯৬৯-৭০	১,২০৮.২	৮৭.১%	১৭৯.২	১২.৯%
১৯৭৪-৭৫	৯৯০.৪	৪৮.২%	১০৬৪.৯	৫১.৮%
১৯৭৫-৭৬	১,৩০৯.০	২৯.২%	৩,১৮১.৬	৭০.৮%
১৯৭৬-৭৭	১,৫২৬.৩	২৫.৩%	৪,৫১৪.০	৭৪.৭%
১৯৭৭-৭৮	১,৫৩৯.১	২০.০%	৬,১৪৩.০	৮০.০%
১৯৭৮-৭৯	১,৬৩৭.৮	১৯.৮%	৬,৬৪৬.৬	৮০.২%

উৎস : পাকিস্তান সরকার, "পাকিস্তান বেসিক ফ্যাক্টস্ ১৯৭৯-৮০"।

উপরের এই দুটো সারণি থেকে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পিপিপি শাসনামলের মূল সময়কালটাতে ব্যক্তি

খাতে পুঁজি বিনিয়োগ কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা যাচ্ছে। তবে এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা ভুল হবে যে পিপিপি পাকিস্তানে এক নতুন ধরনের অর্থনীতি, "সমাজতান্ত্রিক" অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টায় রত ছিল। রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয়ের মূল অংশটা ছিল পূর্ববর্তী সরকারের গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাবদ ব্যয়। রাষ্ট্রীয় খাতে ৬৩% ছিল ইস্পাত প্রকল্পের জন্য ব্যয় যে প্রকল্পটি পাকিস্তানের বেশ পুরোনো এক প্রকল্প। ১৫% ছিল সার কারখানা ও ১০% ছিল সিমেণ্ট কারখানা বাবদ। শেষ দুটো অবশ্য পিপিপি-র প্রকল্প। যেটা পরিষ্কার তা হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যক্তিখাত কাজ করে আসছে এমন ক্ষেত্রসমূহে পিপিপি সরকারী খাত প্রসারিত করার কোনো চেষ্টা নেয়নি। যে ব্যক্তিখাতের পতন ঘটেছিল তার "বিকল্প" হিসেবে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কোনো চেষ্টাই ছিল না।

১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে ঘোষিত পিপিপি-র "অর্থনৈতিক সংস্কার"-এর ঘোষণা অনুযায়ী পিপিপি ১০টি ক্ষেত্রের ৩২টি শিল্প ইউনিটের ব্যবস্থাপনা (মালিকানা নয়) গ্রহণ করে। এছাড়া ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে সব্জী ঘি শিল্পও গ্রহণ করে। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে এইসব "জাতীয়করণ" করা হয়। এটা অর্থনীতিতে বুর্জোয়াদের অবস্থানের চেয়ে বরং তাদের মনের জোরটাকেই বেশী আঘাত হেনেছিল। প্রান্তস্থ পুঁজিবাদে ব্যক্তিপুঁজির ভূমিকাকে খর্ব করা ও দেশের দ্রুত শিল্পায়নবৃদ্ধির জন্য সরকারী খাতের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে পিপিপি কোনোই সিরিয়াস প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বরং "মিশ্র অর্থনীতি" চালু রাখার তার পূর্বের প্রতিশ্রুতি সে বজায় রাখতে চায় এবং ব্যক্তি পুঁজিকে শিল্পে বিনিয়োগ করতে মিনতি জানাতে থাকে। আমলাতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন সমূহকে পিপিপি নেতৃবৃন্দ দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা দেয়ার চাইতে বরং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করে। এগুলো দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও স্বজনপ্রীতির ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং এগুলোর খারাপ হাল এত চরমে পেঁাছায় যে জেনারেল জিয়া এগুলো হস্তান্তরিত করতে চাইলেও ব্যবসায়ীরা আর এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকে না। বর্তমানে যে সব খাতে ব্যক্তি পুঁজি বিনিয়োজিত হচ্ছে, সেগুলি নতুন খাত।

দুর্বল ও অযোগ্য দেশীয় বুর্জোয়াদের তুলনায় মেট্রোপলিটন বুর্জোয়া, বিশেষ করে মার্কিন পুঁজি অত্যন্ত সক্রিয় এবং পাকিস্তানে বর্তমানে বিদ্য-

মান বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে তা' সবচে' শক্তিশালী। যেহেতু এর উৎস দেশের বাইরে, তাই অনেক সময় মনে করা হয় যে এর সামাজিক ভিত্তি পাকিস্তানের বাইরে কিন্তু যে সব সমাজে এটা কাজ করে, সে সব সমাজে এটা একটা সুনির্দিষ্ট আকার নিয়ে ও স্থানীয়ভাবে সক্রিয় থেকেই কাজ করে। এর যে শুধুমাত্র বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে তাই-ই নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রে দ্বৈত উপস্থিতির কারণে এর রাজনৈতিক শক্তিও প্রচণ্ড। আর এই দ্বৈত উপস্থিতি হচ্ছে, প্রত্যক্ষভাবে নিজস্ব সংস্থা সমূহ এবং পরোক্ষভাবে (কিন্তু কোনো অংশেই খাটো নয়) এর নিজস্ব মেট্রো-পলিটন রাষ্ট্র, যা এর স্বপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে দেন-দরবার চালায়।

মেট্রোপলিটন পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক

মেট্রোপলিটন পুঁজির সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের ইতিহাস জটিল এবং অনেকাংশেই স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় এ দেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমান খুবই সামান্য ছিল। এর অধিকাংশ ছিল ব্রিটিশ পুঁজি এবং তা চা-বাগান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত ছিল এবং তার অধিকাংশই ছিল আজকের বাংলাদেশে। বর্তমানে পাকিস্তানে বহু ক্ষেত্রেই বিদেশী পুঁজি খাটছে, প্রত্যক্ষভাবে কিম্বা স্থানীয় পুঁজির সঙ্গে যোগসাজশে, বিশেষ করে ঔষধ শিল্পে। কিন্তু এই দেশে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ মূলতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঘটেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' এসেছে "পি আই সি আই সি" (PICIC) ও "ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান" (IDBP) ইত্যাদি রাষ্ট্র-সৃষ্ট লগ্নি ব্যাঙ্কের ঋণের মাধ্যমে এবং তা মেট্রোপলিটন দেশসমূহে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের জন্যে স্থানীয় বাজারকে দখল করেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহেও তা' নিজেকে বড় আকারে জড়িত করেছে।

এইসব শর্তযুক্ত ঋণের দ্বারা বিদেশী সরবরাহকারীরা তাদের পণ্যের, উঁচু মূল্য বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং খোলা বাজারে এর সঙ্গে পাকি-স্তানী শিল্পপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে চালানের বাড়তি মূল্য (over invoice) দেখিয়ে পাকিস্তানী শিল্পপতিরা এ ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে এবং এভাবে অর্জিত বাড়তি বৈদে-শিক মুদ্রা কালো বাজারে বিক্রী করে তাদের সুদের কিস্তির টাকাটা তুলে নিচ্ছে। আর এ সব কিছুর কারণে পণ্যের যে বাড়তি মূল্য হচ্ছে তার দায়ভাগ পাকিস্তানী ক্রেতাদেরই বহন করতে হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন

শিল্প ছাড়াও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহেও বিদেশী পুঁজি খাটছে, যেখানে শর্তযুক্ত ঋণের কারণে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ২০টি প্রকল্পের উপর জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে যে জিনিষপত্রের প্রায় ৫১% বাড়তি মূল্য ধরা হয়েছে।[৮]

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র বা প্রকৃত অর্থে তার একটা বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পঞ্চাশের মাঝামাঝি স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উপর পাকিস্তানের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা এই সত্যটা অনেক সময় ঢেকে রেখেছে যে এই সম্পর্ক ছিল পুরোপুরিই অসম এবং যুক্তরাষ্ট্র তার অন্যান্য স্বার্থের প্রতি চোখ রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ককে প্রয়োজন মাফিক বাড়িয়েছে কমিয়েছে। ১৯৫১ সালে মোসাদ্দেক কর্তৃক ইরানের তেল জাতীয়করণ করার ফলে তেল-সমৃদ্ধ পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঐক্যজোট গড়ে তুলতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের মন পাওয়ার চেষ্টা সফল হয়নি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সম্পর্ক তিক্ত থাকায় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে এই আশঙ্কায়, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে তেমন আগ্রহী ছিল না। কারণ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের যতখানি স্বার্থ জড়িত ছিল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ততখানি ছিল না। এই সময়কালটাতে পাকিস্তান আসলে একটা "জোটনিরপেক্ষ" নীতিই অনুসরণ করছিল, অবশ্য নিজের ইচ্ছায় নয়। জন্মের প্রথম কয়েক বছর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল থাকার কারণে, পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের কিছু অংশ, অবশ্য প্রচুর সীমাবদ্ধতা নিয়েই, কিছুটা "জাতীয়তাবাদী" নীতি গ্রহণ করার সুযোগ পায়। এই লক্ষ্যে খুবই স্বল্প পরিচিত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ ছিল দেশীয় পুঁজির ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রসার রোধ করা। দেশীয় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ও বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের স্বপক্ষে বৃটিশ ভারতের যে আইন ছিল তা' ১৯৪৮ সালে উল্টে দেয়া হলো।[৯] ঘোষণা দেওয়া হলো যে যেহেতু বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের মূল কাজ হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ যোগানো, তাই বন্দর শহরগুলো ছাড়া অন্য কোথাও তার শাখা অফিস খুলতে দেয়া যাবে না। এই পদক্ষেপ জায়মান পাকিস্তানী বুর্জোয়ার পক্ষে খুব ভাল কাজ করেছে। ১৯৬০ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর পাকিস্তানের

ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণে এই আইন পরিবর্তন করা হয় এবং বিদেশী ব্যাঙ্ক, বিশেষ করে মার্কিন ব্যাঙ্কসমূহকে দেশের ভেতরের শহরসমূহেও কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়।

১৯৫০-এর দশক থেকেই, যখন থেকে পাকিস্তানকে পশ্চিম এশিয়ায় পশ্চিমা সামরিক রণনীতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো, পাকিস্তান বিদেশী সাহায্য কর্মসূচী, বিশেষ করে, মার্কিন সাহায্য পেতে থাকল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ইরাকে কাসেমের ক্যু-র পরে ৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের জন্যে একটা নতুন রণনীতি স্থির করে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সময়কাল ছিল ১৯৬৫ সাল যখন ভারতের (যা চীনের সঙ্গে তার সংঘর্ষের পর যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে প্রচুর সামরিক সাহায্য পেয়েছিল) সঙ্গে যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানে সকল সামরিক সাহায্য ও অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করে দেয়া হলো। যারা খুব সরলভাবে বিশ্বাস করত যে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ঐক্য পাকিস্তানের হাতকে শক্তিশালী করবে তাদের সেই এ বিশ্বাস এ ঘটনায় প্রচণ্ড টোল খেল। আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশসমূহ যে পাকিস্তানে আবার সামরিক সাহায্য দেয়া শুরু করেছে তার মধ্যে আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই লক্ষ্য করছি। সংক্ষেপে এটাই বলার যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক নানা পর্যায়ে নানারকম হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই তা' হয়েছে মেট্রোপলিটন পুঁজি ও মেট্রোপলিটন রাষ্ট্রসমুহের স্বার্থ অনুযায়ী ও উদ্যোগে, পাকিস্তানের উদ্যোগে নয়।

অর্থনৈতিক ভাবে পাকিস্তান মেট্রোপলিটন দেশসমূহ, বিশেষ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। শর্তযুক্ত ঋণের মাধ্যমে তা পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। যন্ত্রপাতি ও মেশিনপত্র সাধারণের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রী করা হচ্ছে এবং পরামর্শপ্রদান (consultancy), পরিকল্পনা ও জরীপ ইত্যাদি বাবদ বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।[১০] ফলে পাকিস্তানের ঘাড়ে এক পর্বত প্রমাণ বৈদেশিক ঋণ চেপে বসেছে (বাংলাদেশসহ)। ১৯৬০ সালে এর পরিমান ছিল ০.২ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭৯ সালের শেষ অবধি পাকিস্তানের একারই বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮'০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৭৯-৮০ সালে যদিও এর

বিগত বছরটার তুলনায় রপ্তানী বেড়েছিল ৪৪%, তবুও সেই বছরই বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ মোট রপ্তানী আয়ের ৩৮%-ই দিয়ে দিতে হয়েছে। ওপেকভুক্ত দেশসমূহ থেকে পাওয়া ঋণের অঙ্ক বছরে বছরে বিভিন্ন রকম হয়েছে এবং পরিমাণে বেশ কম। ঋণ সাহায্যের বড় অংশটাই এসেছে পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে।

অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী শ্রেণী তিনটির তুলনায়, নিম্নবর্গের শ্রেণীগুলির অবস্থান খুবই দুর্বল। কৃষক ও ক্ষেতমজুররা, যদিও নিজ নিজ এলাকায় সময় সময় বেশ জঙ্গীপনা দেখিয়েছে, তবুও তারা শ্রেণীগত ভাবে সংগঠিত নয়। তারা এখনও ভূ-স্বামীদের নেতৃত্বাধীন "উপদল" সমূহে বিভক্ত যাদের উপর পিপিপি তার গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী সাফল্যের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল এবং যাদের কাছে থেকে পিপিপি-র বিচ্ছিন্নতার কারণেই ১৯৭৭ সালে সামরিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ভুট্টো-বিরোধী আন্দোলনে ভুট্টো সরকারের পতন ঘটে।

শিল্প শ্রমিকশ্রেণী স্বাধীনতার সময়ে যাদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য, তাদের জঙ্গীপনা ও সংগঠন বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনে এই শ্রেণী তার ভূমিকা রাখে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্বল এবং ৭০-এর দশকে পাকিস্তানের শিল্পের অবনতি ঘটায় তা' আরো দুর্বলতর হয়েছে এবং বর্তমানে পাকিস্তানে সামরিক শাসন দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে। জঙ্গী কর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক রাখা হচ্ছে। বর্তমানে অবস্থা আরো খারাপ। শ্রমিক শ্রেণী জাতিসত্ত্বার ধারায় বিভক্ত। পাকিস্তানের শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে যা করাচীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশটাই ছিল ভারত থেকে আগত উর্দু ভাষী শরণার্থী। পরে দেশের অন্যান্য শহরেও শিল্পায়নের প্রসার ঘটলে, নতুন শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশই আসে দারিদ্র্য-পীড়িত উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের কৃষি-অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার জাতিগত বিরোধের সুযোগ শোষকরা নিচ্ছে এবং নিচ্ছে চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল "জামাত-এ-ইসলামী", যে দলটি মার্কিন সংস্থাসমূহ, ভূ-স্বামী ও বুর্জোয়াদের একাংশের অপার সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে।

পাকিস্তানী সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলির মধ্যে আমাদের অবশ্যই সংক্ষেপে শিক্ষিত চাকুরীজীবী শ্রেণীটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে শ্রেণীটি ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশিকোত্তর দেশসমুহের রাজনীতিতে একটা অতি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় এই শ্রেণী-টাই পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে সবচে' জোর সমর্থন যুগিয়েছিল—যে আন্দোলন ছিল কম সুবিধাপ্রাপ্ত একটা জাতিসত্তা হিসেবে মুসলমান সমাজের আন্দোলন, একটা ধর্মীয় মতাদর্শ হিসেবে, ইসলামের আন্দোলন নয়। তাই এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যেকার ধর্মীয় মতাদর্শগত দল ও গ্রুপসমূহ, যেমন, জামাত-এ-ইসলাম, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল, অন্যদিকে এ আন্দোলনের প্রধান নেতা জিন্নাহ্ তাঁর চিন্তা-চেতনা ও জীবন-যাপনে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও পশ্চিমা চিন্তার ধারায় অভ্যস্ত। জিন্নাহ্ শিক্ষিত চাকুরীজীবী মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছিল যারা নিজেদেরকে হিন্দু ও অন্যান্য প্রতি-যোগীদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থানে আছে বলে মনে করত।

মুসলমান হিসেবে তাদের পৃথক জাতিসত্তাগত পরিচয় ভারতের কর্তৃত্ব-শালী অন্যান্য জাতিসত্তার বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। জাতি-সত্তার ধারণা অনেক সময় যে রকম মনে করা হয়, সে রকম স্থির, চিরন্তন ও সাংস্কৃতিক ভাবে নির্ধারিত কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। তবে রাজনৈতিক-ভাবে টেকসই ও সমপ্রদায়ের আরো ব্যাপক অংশকে আন্দোলনে টেনে আনার জন্যে জাতিসত্তার মতাদর্শকে অবশ্যই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের কথা বেশী করে বলতে হয়। জাতিসত্তার বিষয়টি তাই একটি অবস্থাগত ও রাজনৈতিক বিষয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় যখন আবার নতুন করে একটা সামাজিক বিন্যাস ঘটে তখন তার সংজ্ঞা পুনরায় পরিবর্তিত হতে পারে। পাকিস্তান একবার তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদ তার তাৎপর্য্য হারিয়ে ফেলে কারণ ভারতের কম সুবিধা-ভোগী মুসলমান সমপ্রদায়ের একটা নিজস্ব রাষ্ট্র তো হয়েই গেছে। তবে পাকিস্তান হওয়ার পর তারা চাকুরীজীবীদের মধ্যে সুবিধাভোগী ও কম সুবিধাভোগী এ রকম ভাগে নিজেদের বিভক্ত দেখতে পায়। পাঞ্জাবী ও উর্দু ভাষী উত্তর-ভারত থেকে আগত "মুহাজির" চাকুরীজীবীরা নতুন সুবিধা-ভোগী এবং বাঙ্গালী, সিন্ধী, পাঠান ও বালুচরা নিজের কম সুবিধাভোগী হিসেবে আবিষ্কার করে। ফলে আমরা দেখি যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর "মুস-লিম জাতি"-র সেই পুরোনো পরিচয় দ্রুত মুছে যাচ্ছে এবং চাকুরীজীবীরা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলগত ও ভাষাগত পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন দাবী করেছে।

এসব দাবী মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে সুবিধাভোগী গ্রুপগুলো এমন-ভাবে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে ইসলামী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় যেমনটা পাকিস্তান আন্দোলনের মাঝে ছিল না। তারা পাকিস্তানের ধারণাকে একটা ইসলামী দেশ ও সমাজ এবং নাগরিকত্বের ধারণাকে মুসলমান হিসেবে উপস্থিত করল। এই দৃষ্টিভঙ্গী অঞ্চলগত জাতিসত্ত্বাসমূহের বৈধতার বিরোধী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাঝে একটা সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে, কারণ জনগণের অন্যান্য যে কোনো অংশের চেয়ে আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী অনেক বেশী পশ্চিমা-ঘেঁষা ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, ফলে তথাকথিত "ইসলামী রাষ্ট্র"-এর প্রতি তাদের স্বীকৃতির মধ্যে কিছুটা অসূয়া বিদ্যমান থাকতে বাধ্য। সমাজ-কাঠামো ও রাষ্ট্রের পদসমূহের আরো ন্যায্য বন্টনের ব্যাপারে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদসমূহের যে দাবী, নিজেদের সুবিধাভোগী অবস্থানটা বজায় রাখার জন্যে তার বিরোধিতা করার লক্ষ্যেই এটা তাদের একটা পাল্টা আঘাত। রাষ্ট্রযন্ত্রে সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণীটি ইসলামী মতা-দর্শের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করার ফলে পাকিস্তানে ইসলামী মতাদর্শের সমস্যায় কিছু নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং যেহেতু এই আনুগত্যের পেছনে অসূয়া ও ভণ্ডামী কাজ করেছে, ফলে তা' মোটেই স্ব-বিরোধিতা ও দুর্বলতা-মুক্ত নয়।

এইসব শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীটি পাকিস্তানের "শাসকশ্রেণী"? পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রধান যে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের সামরিক অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত "সামন্তবাদী" "আধা-সামন্তবাদী" ও "সামন্তজাতীয়" শ্রেণীটিই ছিল পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী। তবে একটা কথা যোগ করা দরকার যে অনেকসময়ই পাকিস্তান (ও ভারতের) সমাজে ঔপনিবেশিক পুঁজি ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রে এসব শ্রেণীভিত্তির একটা যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছাড়াই এসব "শ্রেণী" আখ্যা যত্রতত্র ব্যবহার করা হয়েছে (অনেক সময়ই এসব শব্দের যথার্থ অর্থ ও কাঠামোগত তাৎপর্য্য অনুধাবন না করেই)। ১৯৫৮ সালের আগে একটা "সামন্ত" শ্রেণী পাকিস্তানে ক্ষমতায় ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গী এই কারণ থেকে ঘটেছে যে সেই সময়টা অবধি পাকিস্তানে সরকারের ধরন ছিল সংসদীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃহৎ ভূ-স্বামী শ্রেণীর উপরই ব্যাপকভাবে ন্যস্ত ছিল। বলা হয়ে থাকে যে আইয়ুবের সরকার একটা "বুর্জোয়া বিপ্লব"-এর প্রতিনিধি যে কারণে নেতৃত্ব দেশী বুর্জোয়া ও

গ্রামীণ পুঁজিপতিদের হাতে হস্তান্তরিত হলো। এই ধারার শ্রেণী বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাহলে ভুট্টো সরকারের উত্থান ছিল পুনরায় সামন্তশ্রেণী দ্বারা ক্ষমতা দখল যা আবার সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ফলে বুর্জোয়াদের হাতে পরাস্ত হলো। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাহলে রাজনৈতিক দল সামন্তবাদের ও সামরিক শাসন বুর্জোয়াদের উত্থান বোঝাচ্ছে। এই উপসংহার টানা বস্তুতঃ পাকিস্তানের শ্রেণী কাঠামো ও শ্রেণী বিন্যাস এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল ও সামরিক বাহিনীর অধীন সরকার সমূহের পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতায় পালাবদল সম্পর্কে এক মৌলিক ভ্রান্ত ধারণা থেকেই উদ্ভূত।

আমি কাঠামোগত সমস্যাটা অন্যত্র[১১] আলোচনা করেছি। এখানে আমি শুধু ওই ধারণাটিই আরেকবার পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে পাকিস্তানের জমির মালিক শ্রেণীগুলি সামন্তবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, ফলে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদের শক্তিসমূহের সঙ্গে তারা কোনো কাঠামোগত ও বৈরী দ্বন্দ্বে লিপ্ত নয়। বরং প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী কাঠামোর অন্তর্গত হওয়ার ফলে পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা অনুযায়ী এই শ্রেণীটিও দেশীয় বুর্জোয়া ও মেট্রোপলিটন বুর্জোয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলে। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই প্রশ্নে আমরা দেখব যে অন্য দুটি নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর মতই এ শ্রেণীটিরও, এদেশে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের কাঠামো রক্ষা ও তা' পুনরুৎপাদনের সমান ঝোঁক রয়েছে। বর্তমানে আমরা শ্রেণী-শাসনের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলীয় সরকার ও সামরিক শাসনের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা এটা দেখাতে চেষ্টা করব যে, পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সরকারসমূহ কোনো বিশেষ পর্যায়ে এককভাবে কোনো বিশেষ একটি শ্রেণীর (যেমন, "সামন্ত" শ্রেণীর) স্বার্থ রক্ষা করেছে, না প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী কাঠামো বজায় রাখা ও তা' পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনটি শ্রেণী দ্বারা গঠিত একটি ঐক্যশক্তিকে (power bloc) সহায়তা করেছে। তাছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীগুলোর মাঝে মধ্যস্থতা করার কাজটিও রাষ্ট্রই করেছে। প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা ও এই তিনটি শ্রেণীর যৌথ স্বার্থের অধীন থাকার পরেও রাষ্ট্র যে এটা করতে পেরেছে তার কারণ এর নিজস্ব স্বাধীনতা। এটাই হচ্ছে "রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা" শব্দটির অর্থ, যে শব্দটিকে প্রায়শঃই একটা অর্থহীন শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো একক শ্রেণীকে শাসকশ্রেণী বলা সঙ্গত হবে না।

রাষ্ট্রের নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে যে তা' কোনো একক শ্রেণীর স্বার্থ বেশী দেখছে না এবং তা' থেকেই আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা খুঁজে পাব। আইয়ুবের সামরিক অভ্যুত্থানের আগের এগারো বৎসর সময়কালটাতে পাকিস্তানে সামন্তশ্রেণী মূল "শাসকশ্রেণী" ছিল বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখি যে, সে সময়কার সরকারী কার্যাবলী এই ভূ-স্বামী শ্রেণীর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়ে এসেছে। তা' হলে সামন্তশ্রেণী প্রকৃত "শাসকশ্রেণী" ছিল বলার যুক্তির অসারতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

ভূ-স্বামী শ্রেণীসমূহ

আমরা এর আগেই দেখেছি যে কেমন সক্রিয়ভাবে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্র দেশীয় শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে। এ ব্যাপারে একটা নির্ধারক উদাহরণ হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক ভূ-স্বামী শ্রেণীগুলির স্বার্থের বিপক্ষে বিনিময় হার নির্ধারণ করা। এর ফলে শিল্পপতিদের তাদের আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির জন্য কম মূল্য (এবং যা আবার তাদের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক) দিতে হচ্ছে। কিন্তু আবার অন্য দিকে কৃষিপণ্য রপ্তানীর মূল্য কমে যাওয়ায় ভূ-স্বামী শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্টার্লিং অঞ্চলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুদ্রার মান অবমূল্যায়ন না করার ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের যে সিদ্ধান্ত, পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক অবস্থানের উপরে তার প্রভাব সম্পর্কে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। এটা তাদের জন্য আমদানী পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক মুনাফার সৃষ্টি করে এবং শিল্প বিনিয়োগের মূল্য অনেক কমিয়ে দেয়। কিন্তু আবার এই পদক্ষেপের কারণে কৃষিপণ্যের উৎপাদকরা বিদেশে রপ্তানী-মূল্যের চেয়ে তাদের বিক্রয়মূল্যে অনেক কম টাকা পায়। বিনিময় হারের এই ঝড়-ঝাপটাটা পুরোটাই বহন করতে হয় ভু-স্বামী ও কৃষকদের। এই রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে, যা সরাসরি ভূ-স্বামী শ্রেণীর বিপক্ষে গেছে, এ বলার অবকাশ আর নেই যে ভূ-স্বামী শ্রেণী "শাসকশ্রেণী" ছিল। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট দুর্বল ও অকার্যকরী বুর্জোয়ারাও এসব নীতি নির্ধারণ করেনি। এগুলো নির্ধারিত হয়েছে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের নির্দেশে।

১৯৫৫ সাল নাগাদ বিনিময় হারের ব্যাপারে বুর্জোয়া ও ভূ-স্বামীদের স্বার্থ একাত্ম হতে থাকে। পাকিস্তানী শিল্পপতিরা তখন তুলা ও পাট শিল্প-জাত পণ্য নিয়ে রপ্তানী বাজারে উপস্থিত হয়েছে। উচ্চ বিনিময় হার

আর তাদের জন্য মঙ্গলজনক ছিল না, কারণ তা' রপ্তানী পণ্যের বাজারে তাদের পণ্যের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা হ্রাস করে ফেলেছে। ফলে তারা মুদ্রার অবমূল্যায়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ভূ-স্বামীরাও এ জিনিষটা খুবই অন্তর দিয়ে চাইছিল। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের দাম কম ছিল। সরকার ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই মুদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ অবমূল্যায়ন করে।

আইয়ুব আমলে বুর্জোয়া ও ভূ-স্বামী দুই পক্ষকেই খুশি রাখার একটা অভিনব পদ্ধতি বের করা হয়। এটা হচ্ছে "বোনাস ভাউচার স্কীম" "(Bonus Voucher Scheme) যা বস্তুতঃ হচ্ছে বিভিন্ন মানের বিনিময় হার। জটিল বিশদে না যেয়ে আমরা বলতে পারি যে এই পদ্ধতির মূল বিষয়টা ছিল পাকিস্তানী মুদ্রার একটা উচ্চ সমতা বজায় রাখা যা দিয়ে শিল্পপতিরা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কম টাকায় আমদানী করতে পারে। এতে কৃষি ও শিল্প পণ্যের রপ্তানীকারকেরা একটা মধ্যমানের হার (পরিবর্তনশীল) অনুযায়ী সমতা হারের চেয়ে ৫০% বেশী টাকা পাবে। ভোগ্যপণ্য আমদানীকারকদের জন্য রয়েছে তৃতীয় একটা বিনিময় হার যা ছিল সমতার হারের দুই বা আড়াই ভাগ। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি চলে তবে বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পর একটা তৈরী বাজার হারানোর ফলে পাকিস্তানী শিল্পপতিরা বেকায়দায় পড়লে এর পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসে ভুট্টো সরকার মুদ্রার ৫৭% অবমূল্যায়ন করেন যা পুনরায় পাকিস্তানী শিল্পপতিদের একটা কঠিন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে সামন্ত-বিরোধী বলে কথিত আইয়ুব সরকারের আমলে ভূ-স্বামীরা যত ভাল অবস্থায় ছিল এমনটি আর কখনো ছিল না। যে জিনিষটি উল্লেখ করা হয় তা' হচ্ছে ১৯৫৯ সালের ভূমি-সংস্কার যা বস্তুতঃ ছিল নিতান্তই প্রতীকধর্মী এবং তা'মোট আবাদী জমির মাত্র ১.৬% এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছিল।[১২] তাছাড়া ভূ-স্বামী শ্রেণী সবচে' শক্তিশালী প্রতিনিধি কালাবাগের নওয়াবকে পশ্চিম পাকিস্তান গভর্নর বানানো হয়, যে গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে আসীন থেকে তিনি ভূ-স্বামী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ তৎপর থাকেন। ফেডারেল সংবিধান অনুযায়ী কৃষি ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ প্রাদেশিক সরকারের আওতাধীন থাকায় এগুলো তার কর্তৃত্বাধীন ছিল। তাঁর সহযোগী ছিল মালিক খুদা বখ্‌শ বুচচা, যে ছিল ভূ-স্বামী শ্রেণীর একজন যোগ্য মুখপাত্র এবং একই সময়ে যে নিজেকে একজন যোগ্য প্রশাসক

হিসেবেই প্রমাণিত করে ভূ-স্বামী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকে। কালাবাগ নিহত হওয়ার পরও বুচচা এই ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের আমলে) পালন করতে থাকে।

খাদ্য ও কৃষি কমিশনের রিপোর্টে (১৯৬০ সালের নভেম্বরে) কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কালাবাগ ভূ-স্বামী শ্রেণীগুলির জন্য তার নতুন কর্ম-সূচী হাজির করে। জমির মালিকদের ঋণ প্রদানের সংস্থাগুলি পুনর্গঠিত করা হলো, পাকিস্তানে কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হলো যা গুণগত এক নতুন মাত্রায় তার কার্যবলী সম্পাদন করার যোগ্যতাসম্পন্ন হলো। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও অন্যান্য নানা সংগঠন গড়ে তোলা হলো এবং কৃষি বিভাগকে প্রসারিত ও পুনর্গঠিত করা হলো। কৃষি উপকরণের উপর ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকী দেয়া হলো। গমের উচ্চ মূল্য প্রদান করা হলো। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন আপত্তি তুললেও সে আপত্তি কোনো কাজে লাগল না। গ্রামীণ ওয়ার্কস প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হলো। এর ফলে ছোট কৃষকদের চেয়ে বরং ধনী ভূ-স্বামীদের প্রয়োজন ও স্বার্থ অনুযায়ীই সম্পদ প্রদান করা হলো এবং "মৌলিক গণতন্ত্র"-এর কল্যাণে এই সম্পদ সরাসরি গ্রামের কর্তৃত্বশালী ভূ-স্বামীদের করায়ত্ত হলো। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানের "সবুজ বিপ্লব"-এর ভিত্তি।[১৩]

কৃষিতে যন্ত্রায়নের ফলে ব্যাপকহারে বর্গাচাষী উচ্ছেদের ঘটনা বিকল্প নীতি গ্রহণের প্রশ্নে আমলাতন্ত্রের মধ্যে নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। বিষয়টির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মার্কিন প্রশাসনের এক অংশও এই বিতর্ককে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কমিশন সুস্পষ্টভাবেই এর বিরোধিতা করে। কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও ভূ-স্বামীদের লবিই জয়লাভ করে। ১৯৬৯ সালে এই বিতর্ক আবার উপস্থিত হয় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের অর্থ ট্রাক্টর আমদানীতে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু ভূ-স্বামী লবির চাপে, যারা রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর মাঝে যথেষ্ট প্রভাব রাখে, কৃষিতে আরো যন্ত্রায়নের বিরোধিতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আসলে অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে আইয়ুবী আমলেই ভূ-স্বামী ও সাথে সাথে বুর্জোয়াদের স্বার্থ সবচে' বেশী রক্ষা করা হয়েছে। তাই এই সরকারের আমলে বৃহৎ ভূ-স্বামীদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মার্কিন পুঁজির নেতৃত্বাধীন মেট্রোপলিটন বুর্জোয়াদের পাকিস্তানে একটা কাঠামোগত উপস্থিতি ছিল। আর তা' ছিল তাদের মালিকানাধীন কিম্বা দেশীয় ব্যক্তি বা সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারী দ্বারা, কিম্বা, পাকিস্তানের শিল্পপতি, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তান সরকারকে ঋণ প্রদানের দ্বারা। অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী তিনটি শ্রেণীর মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচে' শক্তিশালী। তবে যদিও এ দেশে তার প্রচণ্ড ক্ষমতা ও দাপট রয়েছে তবুও ঔপনিবেশিক শাসনের মত পাকিস্তান সরকারের উপর তার নীতি অত সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে সে চাপিয়ে দিতে সক্ষম নয়। সে নিজে "শাসকশ্রেণী" নয়।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন সময় গেছে যখন সরকার পরিবর্তনে ও নতুন সরকার বসানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র মূল ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক ঐক্যজোটে আবদ্ধ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী সামরিক স্ট্রাটেজীর স্বার্থে "মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা" ও নিজের তেল-স্বার্থ রক্ষার জন্য পাকিস্তানের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে। এই নীতি থেকে পাকিস্তানের নিজের কিছুই পাওয়ার ছিল না এবং সে মূলতঃ একটা ভাড়াটে ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়। তবে আবার সমানভাবে, এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে পাকিস্তান মেট্রোপলিটন পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। যেমন, আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি যে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর অন্যতম প্রথম যে একটি কাজ হাতে নেওয়া হয় তা হচ্ছে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোর দেশের ভেতর প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করা ও তাদেরকে "বন্দর নগরী" সমূহে (যার মধ্যে আভ্যন্তরীণ বন্দর নারায়ণগঞ্জ ছিল; অবশ্য নারায়ণগঞ্জ মূলতঃ একটি পাট রপ্তানী কেন্দ্র।) আবদ্ধ রাখা।

এই পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তানী ব্যাঙ্কগুলি ব্যাপকভাবে সারা দেশে নিজেদেরকে প্রসারিত করতে ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় এবং এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হতো না। আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর অবস্থাটা পাল্টে যায় এবং মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশী ব্যাঙ্ক দেশের ভেতরের শহরগুলিতে তাদের শাখা বিস্তারিত করে। মেট্রোপলিটন বুর্জোয়া ও দেশীয় বুর্জোয়ার মধ্যেকার সংঘাতের আরো অনেক উদাহরণই টানা যায় যেসব সংঘাতের ফসল সর্বদা মেট্রোপলিটন বুর্জোয়াদের পক্ষে যায়নি। তবে এ ধরনের সংঘাতের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন দেশসমূহও

অনেকসময়ই পাল্টা আঘাত হেনেছে, যেমন ঋণ বন্ধ করে দেয়া। মেট্রোপলিটন বুর্জোয়ারা অনেক ক্ষমতা ধরে। কিন্তু উপনিবেশোত্তর দেশসমূহের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তাকে অনেক সময়ই চাপ প্রয়োগ বা ভয়ভীতি দেখানোর সাথে সাথে কৌশলের আশ্রয়ও নিতে হয়। একই সঙ্গে দেশীয় বুর্জোয়ার মতই তাকেও অনেকসময়ই ঘুষ দিয়ে কাজটা আদায় করে নিতে হয়। ফলে মেট্রোপলিটন বুর্জোয়ার প্রচণ্ড ক্ষমতা ও প্রভাবকে মেনে নিয়েও তাকেই "শাসকশ্রেণীটি" হিসেবে আখ্যায়িত করা ঠিক বলে আমরা যুক্তিসম্মত মনে করি না।

তাহলে বর্তমানের এই পর্যায়ে আমরা আর ঠিক কীভাবে অগ্রসর হতে পারি যখন আমরা এই উপসংহার টেনে ফেলেছি যে আলোচ্য ওই তিনটি কর্তৃত্বস্থানীয় শ্রেণীগুলির কোনোটিকেই যথার্থভাবে শাসকশ্রেণী হিসেবে আখ্যায়িত করা যাচ্ছে না? এর মানে কি এই যে আমরা রাজনৈতিক শক্তি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণার ব্যাপারে শ্রেণীভিত্তির প্রসঙ্গটি বাদ দিচ্ছি এবং একটা মুক্ত, ভাসমান, স্বয়ংচালিত রাষ্ট্রের ধারণা মেনে নিচ্ছি যে রাষ্ট্র কোনো সামাজিক ভিত্তি ছাড়া নিজের স্বাধীন যুক্তি ও "ইচ্ছে" দ্বারা পরিচালিত হয়? অবশ্যই নয়। আমরা মনে করি যে শ্রেণীবিভক্ত একটা সমাজে, যেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে কর্তৃত্বশালী ও অধীনস্থ শ্রেণী বিদ্যমান, সেখানে শ্রেণীনির্ভর সামাজিক অবস্থা টিঁকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর একটা অপরিহার্য উপাদান। এটা সেই সামাজিক অবস্থা পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নিশ্চিত করে যার মাঝে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণী তিনটি নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সিভিল সোসাইটির মাঝে রাষ্ট্রের এই ভূমিকা প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের এক "কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা"। রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালী বোঝার ক্ষেত্রে আমরা এই ধারণাটিকে মূল চাবিকাঠি হিসেবে উপস্থিত করছি।

আমি আমার বিশ্লেষণের মূল ধারণা হিসেবে যে "কাঠামোগত নির্দেশ"-এর ধারণা তুলে ধরেছি তাকে যেন ভাষাগত সাযুজ্যের কারণে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি পুঁজিপতি বিশেষের আচরণের ব্যাপারে কাঠামোবাদী (কার্যকরবাদী) কারণ বা "নির্ধারক" কোনো কিছু হিসেবে ভুল না করা হয়। ওই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ব্যক্তিরা ও সদস্যরা কাঠামোর অক্ষম নিমিত্ত মাত্র এবং তাদের কার্যকলাপ শুধুমাত্র কাঠামোগত নির্দেশনামা দ্বারাই

পরিচালিত। আমাদের ব্যক্ত ধারণা অনুযায়ী, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পুঁজিপতির প্রকৃত কার্যকলাপ নির্ধারণের প্রশ্নে কাঠামোগত শর্তাবলীই যে যথেষ্ট তা' বোঝায় না। আমাদের ধারণা অনুযায়ী তারা শুধুমাত্র পূর্ব-নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনেতা মাত্র। আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিশ্লেষণ করতে চাইছি সে দৃষ্টিভঙ্গী একদিকে কাঠামোগত শর্তসমূহকে যেমন হিসেবে রাখে, তেমনি, তা' একই সঙ্গে ও দ্বান্দ্বিকভাবে, রাষ্ট্রের অধিকর্তা ও ব্যক্তি পুঁজিপতিদের সচেতন কার্যাবলীকেও হিসেবে রাখে।

"কাঠামোগত নির্দেশ" হচ্ছে তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজের (প্রান্তস্থ বা অন্যকিছু) কার্যপ্রণালীর যৌক্তিক ভিত্তি। তবে পুঁজিবাদী বিকাশের অধীনেই নানা রকম রূপের রকমফেরের ব্যাপক সুযোগ রয়ে গেছে।

এই ধারণা অনুযায়ী রাষ্টীয় নীতিকে প্রভাবান্বিত করার দু'টি পথ আমরা দেখতে পাই। একটি হচ্ছে প্রকাশ্যভাবে বা রাষ্টীয় যন্ত্রের মধ্যেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নেতৃস্থানীয় শ্রেণীসমূহ, এবং অধীনস্থ শ্রেণীসমূহেরও, দাবীর মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগুলির স্বার্থরক্ষা উদ্দেশ্য হলেও রাষ্ট্রযন্ত্রে যারা বসে আছে, অনেকসময়ই, নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর চাহিদার বিপরীতে গিয়েও তাদেরকে, প্রান্তস্থ পুঁজিবাদ ও তার কাঠামোগত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

"কাঠামোগত নির্দেশ"-এর ধারণাটি আমাদেরকে সমস্যার সেই দিকটি বুঝতে সাহায্য করে যা অনেকসময়ই রাষ্ট্রের "আপেক্ষিক স্বাধীনতা" নামে পরিচিত। তবে শুধুমাত্র একটা তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে রাষ্ট্রের "আপেক্ষিক স্বাধীনতা" কথাটি অর্থহীন। "কাঠামোগত নির্দেশ"-এর ধারণাটিই আমাদের সমস্যাটি আরো সরাসরি বুঝতে সাহায্য করে। আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা এবং ব্যক্তি পুঁজিপতি ও অন্যান্য শ্রেণীর সদস্যরাও সচেতন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত যার মধ্যে রয়েছে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহও। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই তারা ঠিক করে যে তাদের কাজের ফলাফল কি ঘটবে। রাষ্ট্র প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের অধীন এবং পুনরুৎপাদনের জন্যে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কার্যাবলী পালন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব সময়ই যে অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী শ্রেণীগুলির কথা মেনে চলবে, তা' সঠিক নয়। কর্তৃত্বশালী শ্রেণীগুলির প্রকাশিত ইচ্ছা থেকে নিরপেক্ষ থেকেও অনেকসময় তারা স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণ করতে পারে।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রাষ্ট্র এমনকি বুর্জোয়াদের জন্ম ও বিকাশকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। সেক্ষেত্রে এই বুর্জোয়াদের "শাসকশ্রেণী" বলা বাস্তবতার প্রতি সুবিচার নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রান্তস্থ পুঁজিবাদ (peripheral capitalism) ও তার কাঠামোগত নির্দেশ (structural imperative) দ্বারাই পরিচালিত হয়ে এসেছে।

যদিও আমরা বলেছি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের কার্যকরিতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তবুও আমাদের এই বিশ্লেষণ এই সম্ভাবনাও উন্মুক্ত রাখে যে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের "বিপক্ষে"-ও কাজ করতে পারে। আমাদের বিশ্লেষণের ধারা ও কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তার ধারণা আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে মতাদর্শের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সচেতনভাবে নেয়া কিম্বা মতাদর্শ দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া এ ধরনের সকল রাষ্ট্রীয় নীতির মূল পরীক্ষা হচ্ছে এই সব নীতি ও কাজের প্রকৃত ফলাফল কি। একইভাবে কোন্ পথে গেলে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদ বেশী বিকশিত হবে সে প্রশ্নে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে যেসব প্রকৃত মতপার্থক্য রয়েছে, আমাদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে তাকেও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। নেতিবাচক কোনো পলিসি, যা ভুল হিসাব বা মতাদর্শগত ভ্রান্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তা পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষতি করতে পারে, সঙ্কট আরো তীব্র করতে পারে এবং ওই পলিসির কার্যকারিতা নস্যাৎ করতে পারে। তবে একটি বিপ্লবী মতাদর্শ গ্রহণ ও প্রান্তস্থ পুঁজিবাদ থেকে সরে আসা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ, কারণ সেক্ষেত্রে আর প্রান্তস্থ পুঁজিবাদ ও সে রকম রাষ্ট্রের প্রশ্নটা আর থাকছে না।

রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলীকে হিসেবে ধরার কারণে রাষ্ট্রকে আমরা কোনো বস্তুগত বিষয় হিসেবে মনে করা থেকে বিরত থাকছি। রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি ও গ্রুপ যারা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করে থাকে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী-উৎস, শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-দুর্বলতা রয়ে যায়, ফলে রাষ্ট্র একটি একশিলাভূত (monolithic) ব্যাপার নয়। রাষ্ট্র একইসঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র, আবার শ্রেণী-শাসন চাপানোর একটা প্রতিষ্ঠানও বটে। রাষ্ট্রের এই দ্বৈত ভূমিকার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়। আমাদের

এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোকে এবং পাকিস্তানের শ্রেণী-বিন্যাসে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমি যে বক্তব্য তুলে ধরেছি তার আলোকে আমরা এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র, বিশেষ করে সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্র (oligarchy) এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা থেকে রাজনৈতিক বিকাশের ধারাটাকে তুলে ধরতে পারি।

সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের চরিত্র

১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ছিল। জাতীয় পরিষদ, যা আবার একই সঙ্গে ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের জন্য একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শাসনতান্ত্রিক পরিষদও (Constituent Assembly), তা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অ-প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ ছিল। একটি প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক এই পরিষদ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। এই প্রাদেশিক পরিষদও গঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে এবং শিক্ষা ও সম্পত্তির ভিত্তিতে এক সীমিত সংখ্যক ভোটদাতা দ্বারা, যাদের সংখ্যা দেশের মোট জনগণের ১৫% ভাগের বেশী নয়।[১৪] ১৯৩৫ সালের উপনিবেশিক ভারত শাসন বিধি (Government of India Act, 1935), যা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাপ্রদানের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা কিছু রদবদল করা হয়, সেটাই অস্থায়ী শাসনতন্ত্র হিসেবে চলতে থাকে। নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর পরই সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত ক্রমবর্ধমানভাবে জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদরা, যারা জনগণের ভোট না পাওয়ার ব্যাপারে ভীত ছিল, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ স্থগিত রাখতে শুরু করে। তারা জনগণের ঘৃণা কুড়াতে শুরু করে এবং তাদের যেটুকু কর্তৃত্ব ছিল তা হারিয়ে ফেলে। তারা শুধুমাত্র শক্তিশালী একটি আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত শাসনের একটি আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তে রাষ্ট্রের কার্যকরী ক্ষমতা একটি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্র (Oligarchy)-এর হাতেই ন্যস্ত থাকে। তাই ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান কোনো ক্ষমতা দখলের ব্যাপার ছিল না, কারণ, ক্ষমতা ইতিমধ্যেই তাদের হাতেই ছিল যারা তা "দখল" করতে যাচ্ছে। বরং এই সামরিক অভ্যুত্থান সংসদীয় আবরণটা ছুঁড়ে ফেলে দিল যে সংসদ থাকার কারণে ১৯৫৬ সালের সংবিধান

ও একটি সাধারণ নির্বাচনের দাবী ওই সামরিক-আমলাতান্ত্রিক অলিগার্কির শাসনের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াচ্ছিল।[১৫] দুর্বল ও জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদদের তুলনায় সেনাবাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র ছিল অনেক সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী। ভারতের সঙ্গে বিরোধের কারণে সেনাবাহিনী দেশের অখণ্ডতা ও অস্তিত্বরক্ষার নিশ্চিয়তা প্রদানকারী হিসেবে এক ধরনের ন্যায্যতা অর্জন করে যা পরবর্তী বছরগুলোর রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

সেনাবাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র দুটোই ঔপনিবেশিক আমলের সৃষ্টি। জাতীয়তাবাদী জোয়ারের বিপক্ষে তাদের যে ট্রেনিং তা' তাদের অন্তরে পেশাদারীত্ব ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার একটা ধারণা জন্ম দেয়। আমলারা "অভিভাবকত্বে"-র একটা কল্পনা-বিলাস নিয়ে গড়ে ওঠে যে ধারণা অনুযায়ী তারা মনে করে যে "পেশাদার" রাজনীতিবিদদের তথাকথিত দলবাজী ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাত থেকে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। সেনাবাহিনীও নিজেদেরকে "আইন শৃঙখলা" রক্ষাকারী হিসেবে মনে করে গড়ে ওঠে এবং সেনাবাহিনীর কাছে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরাই আইন ও শৃঙখলার প্রতি সবচে' বড় হুমকি। এটা মনে করা খুবই ভুল হবে যে সেনাবাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ও রাজনীতিতে জড়িত নয় এমনভাবে গড়ে ওঠে। বরং এর বিপরীতটাই সত্য। তাদের পেশার কারণেই, তারা যুগের রাজনৈতিক সংগ্রামে গভীরভাবে জড়িত, তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সময়ে, ঔপনিবেশিক সরকারের জন্য অফিসার বাহিনীর আনুগত্য ও নির্ভরশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর প্রতিফলন আমরা অফিসার রিক্রুট করার কৌশলের মধ্যে দেখতে পাই যেখানে অফিসারদের সামাজিক ব্যাকগ্রাউণ্ডের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। সামরিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মূলতঃ যাদের গ্রামীণ ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে, কিন্তু তেমন অভিজাত নয়, তাদের দিকেই নজর দেয়া হতো। ম্যাকম্যান লেখেন যে, "সেনাবাহিনীর অফিসাররা এসেছে মূলতঃ বয়স্ক শক্ত ভারতীয় কৃষকদের মধ্য থেকে যারা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকের পদ পেরিয়ে কমিশনড অফিসার হয়েছে, এবং তরুণ অফিসাররা এসেছে অপেক্ষাকৃত কম ধনী ভূ-স্বামী শ্রেণী থেকে।"[১৬] যাদের একটা শহুরে ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে, কিম্বা যাদের উচ্চশিক্ষা ছিল, তাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা

হতো না। ম্যাকমানের মত অনুযায়ী, "সামরিক কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিমান তরুণেরা অযোগ্য ছিল। ....সেনাবাহিনীর কর্ণধাররা এটা অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি ভালো অফিসার হবে না।"[১৭] নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ধরনের একপেশে পলিসি আজো কার্যকরী রয়েছে। তবে একটা আধুনিক সেনাবাহিনীর কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী উচ্চমানসম্পন্ন কিছু স্কুল ও কলেজ চালিয়ে থাকে যেখানে সামরিক বাহিনীর অফিসারের সন্তানরা লেখাপড়া করে। তাদেরকে মতাদর্শগত একটা শিক্ষাও দেয়া হয় এবং তারা ভবিষ্যতের অফিসার সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে।

সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন মানের পদের সামাজিক ব্যাকগ্রাউণ্ডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। মূলতঃ দুটি বিষয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের, বিশেষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেলদের, সামাজিক স্বার্থে জড়িত করেছে। প্রথমতঃ সেনাবাহিনীর অফিসারদের (বেসামরিক আমলাদেরও) জমি প্রদানের নীতি—যার ফলে যারা বড় ভূ-স্বামী শ্রেণী থেকে আসেনি তাদেরও জমি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে একটা শ্রেণী স্বার্থ গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ ৬০-এর দশক থেকে অনেক সামরিক অফিসারই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ে এবং কিছু জেনারেল (কিছু বেসামরিক আমলাও) দেশের সবচে' বড় ব্যবসায়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়। অবসর গ্রহণের পর অনেককেই বড় বড় কোম্পানীর বোর্ডে সম্মানজনক ও লাভজনক পদ দেয়া হয় এবং যারা তখনও চাকুরীতে রয়েছে তারাও এ ধরনের পদের প্রত্যাশী হিসেবে এই লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধি করে। পাকিস্তানের বড় বড় বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও একই রকম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক অফিসাররা দেশের তিনটি নেতৃত্বশালী শ্রেণীর সঙ্গেই গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে।

১৯৭৭ সালে বর্তমান সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করার পর এই জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি গুণগতভাবে এক নতুন মাত্রা ও চরিত্র অর্জন করেছে। সর্বস্তরের সামরিক অফিসাররাই তাদের নব্য-অর্জিত ক্ষমতা কোনো না কোনোভাবে নিজেদের বা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের বৈষয়িক সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে ব্যবহার করছে। এর একটা পথ হচ্ছে ভালো বেতনের ও প্রভাবশালী চাকুরী জোটানো। তারা আমলাতন্ত্রের মধ্যে বেশ ভালাভাবেই ঢুকে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৮১ সালের প্রথমদিকে সাতজন মন্ত্রী

ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম চারজন সচিবও ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। সরকারের অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে সেনাবাহিনীর অসংখ্য প্রাক্তন অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সংস্থাপন বিভাগের যুগ্ম-সচিবের পদগুলি যা সকল প্রকার বদলী ও নিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইসব পদকে প্রাক্তন সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনীর আত্মীয়-স্বজনদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের চাকুরীটা আবার সবার প্রিয় নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব হওয়ার চেয়েও অধিকাংশ অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেলরা রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদটি পেতে বেশী আগ্রহী। কারণ এই পদ অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশী লাভজনক এবং এসব পদে অন্যদের সুবিধা প্রদান ও স্বজনপ্রীতির সুযোগ বেশী। রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনসমূহের প্রধান হওয়ার পর এসব সামরিক অফিসাররা পূর্বের কর্মচারীদের ছাঁটাই করে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক প্রাক্তন সেনাবাহিনী বা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের চাকুরীর ব্যবস্থা করে। বোধগম্য কারণেই এর ফলে সামরিক বাহিনী ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অন্যদিকে সেনাবাহিনী এই যে সুযোগ-সুবিধা পেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেকারণে বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তাদের কর্তৃত্ব দূর করাও খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

জোয়ান ও নীচুস্তরের অফিসারদের উপর সামাজিক প্রভাবটা অন্য ধরনের। অধিকাংশ সেপাই ও ছোট অফিসারদের দারিদ্র্য-পীড়িত উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অঞ্চল থেকে নেয়া হয়েছে। যেহেতু কৃষি জীবিকার জন্যে যথেষ্ট ছিল না, তাই ঐতিহ্যগতভাবেই এ অঞ্চলের লোক সেনাবাহিনীতে কিম্বা অন্যান্য শহর-বন্দরে নানা ধরনের কাজে নিজেদের জড়িত করেছে। ৬০-এর দশকের তথাকথিত "সবুজ বিপ্লব"-এর প্রভাব, যা মূলতঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধুর খাল-প্রবাহিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই অঞ্চলে নেতিবাচক ভাবে পড়েছে ও এই অঞ্চলের কৃষকদের প্রকৃত আয় ব্যাপভাবে হ্রাস করেছে।[১৮] এই বিষয়টি সেনাবাহিনীর জোয়ান ও ছোট অফিসারদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে একটা বৈপ্লবিক সংস্কারের চাপ সৃষ্টি করেছিল, ক্ষমতায় যারা ছিল তাদেরকে তা' হিসেবের মধ্যে নিতে হয়েছিল। এটা তিনভাবে করা হলো। প্রথমতঃ বেসামরিক কর্মচারীদের তুলনায় সৈন্যদের বেতন অনেক বাড়ানো

হলো। সেনাবাহিনী তার লোকজনদের জন্যে খুব ভালো শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন করল যা বেসামরিক কর্মচারীদের জোটে না। অবশ্য সৈনিকদের দেশের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনদের জীবনযাত্রার ক্রমনিম্নমানতার কারণে সৃষ্ট অসন্তোষ দূর করার জন্যে এই পদক্ষেপই যথেষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ত: এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে এই অঞ্চলের মানুষজন, এবং বিশেষভাবে সৈন্যদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধা প্রদান করেছে। কিন্তু এর ফলাফল কিছুটা বিপরীত ঘটেছে। কারণ তা' মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু পরিবার, যাদের কেউ মধ্যপ্রাচ্যে যেয়ে অবস্থাকে ভালো করলেও, তাদের হাতে আসা কাঁচা টাকা এলাকায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটাচ্ছে এবং যে সব পরিবারের কেউ যেতে পারেনি, তাদের অবস্থা আগের চেয়েও আরো খারাপ হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত:, সৈনিকদের মাঝে মতাদর্শগত প্রচার বাড়ানো হয়েছে। তাদের মাঝে ধর্মীয় মতবাদ, জাত্যাভিমান ও দক্ষিণপন্থী ধ্যান-ধারণা বেশী বেশী করে ছড়ানো হচ্ছে। সৈনিক ও ছোট অফিসারদের ক্ষেত্রে মতাদর্শের বিষয়টি খুবই জরুরী (কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে নিজ দেশের জনগণকে নিপীড়ন-নির্যাতন করতে হয়) এবং তাদের জন্যে "মনের জোর" খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাদের মন-মানসিকতাকে এক ধরনের জাত্যাভিমানের বিকারে পূর্ণ করে দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামী মতবাদ দিয়ে ও বিরোধীপক্ষরা "ইসলামের শত্রু" এই আখ্যায় চিহ্নিত করে দিলে ভাল কাজ দেয়। তবে যখনই একজন মেজর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হয়, তখনই সে এক ভিন্ন জগতে প্রবেশ করে, এক বাস্তব রাজনীতির জগতে যেখানে মতাদর্শের বেশী কচকচানি রণনীতির ক্ষেত্রে বাধা হয়েই দাঁড়ায়। এই পর্যায়ে আমরা বহু অসুস্থ মনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তবে পাকিস্তানের বর্তমান সেনাবাহিনীর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনার মান সাধারণভাবে কম থাকায় এবং কড়া সেন্সার প্রথার কারণে খোলামেলা তর্ক-বিতর্কের সুযোগ না থাকায় তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে শিক্ষার ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই দুর্বল। কর্ণেল হওয়ার পরপরই অবশ্য একজন অফিসার তার এতদিনকার মতাদর্শগত ট্রেনিং ভুলে যায় না। যদিও তখন দায়িত্বশীল একজন অফিসার হিসেবে সে হিসেব করতে শেখে এবং আবেগ দ্বারা তেমন চালিত হয় না, তবুও এই পরিবর্তনটা খুব সহজে ঘটে না।

বেসামরিক আমলাতন্ত্রের চেয়ে সামরিক বাহিনীর উপর মতাদর্শগত প্রভাবটা বেশী চেপে থাকে।

১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালের আগে পর্যন্ত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী ছিল। ১৯৫১ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক কর্তৃক তেল জাতীয়করণ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা পাল্টে যায়। পশ্চিমা দেশগুলো বুঝতে পারে যে একটা ঘাঁটি এলাকা না থাকার কারণে তারা দ্রুত ও কার্যকরভাবে ইরানে হস্তক্ষেপ করতে পারছে না, আগে যে অভাবটা ব্রিটিশ ভারত পূরণ করে এসেছিল। পাকিস্তানকে এই ভূমিকায় নামানো হলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপন করা হলো। পাকিস্তানকে এমন একটা সামরিক জোটে আবদ্ধ করা হলো যা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা সেনাবাহিনী ও জেনারেল হেড কোয়ার্টারে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপদেষ্টাদের নিয়োগ করা হলো এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানে তারা তাদের প্রভাব ব্যাপকতর করল। সেনাবাহিনীর এই নতুন ভূমিকা পালনে তাকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে একটা সেনাবাহিনী পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করা হলো। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে একটা মার্কিন "সামরিক সার্ভে মিশন" উপস্থিত হলো এবং ওই বছরের অক্টোবর মাসে রাওয়ালপিণ্ডির জেনারেল হেড কোয়ার্টারে একটি মার্কিন "সামরিক সহযোগিতার উপদেষ্টা গ্রুপ" (MAAG) প্রতিষ্ঠা করা হলো।

"পাকিস্তানী অফিসারদের ওপর .... নতুন যোগাযোগ হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের (সামরিক) পরিকল্পনাবিদ ও যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা ও সফর সূচীসমূহ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ইউনিট ও হেডকোয়ার্টারে মার্কিন ট্রেনিং টিম অফিসারদের....নিয়ামক প্রভাবের কথা"[৯] জেনারেল ফজল মুকিম খান লিখেছেন। যেসব পাকিস্তানী ইউনিটকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যের রণনীতিতে প্রয়োজন পড়বে সেসব ইউনিটকে "ইউ,এস, মিলিটারী এসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম" (MAP) বা "ম্যাপ" ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাকিস্তানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাবের কারণে "ম্যাপ" বাহিনীগুলো, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর "অ-ম্যাপ',

অন্যান্য বাহিনীগুলোর, যেগুলো ভারত ও কাশ্মীর সীমান্তে ছিল, চেয়ে বেশী মনোযোগ ও সম্পদ পেয়েছে। তাই কর্ণেল জর্ডানের মতে, ৬০-এর দশকে বৈদেশিক মুদ্রায় সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করার ক্ষেত্রে, যে সঙ্কোচন করা হয়, তা' মূলতঃ "অ-ম্যাপ" বাহিনীগুলোকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।[২০]

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের প্রশ্নে বিশদ বর্ণনায় না গিয়েও বলতে চাই যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক ঐক্য-জোট পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে "কমিয়ে" দিয়েছে। বিশেষ করে যে বিষয়টি পাকিস্তানের জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, সেই ভারতের সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্রে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পর নীচুপদের অফিসারদের যে মোহটা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক ঐক্যজোট পাকিস্তানের জাতীয় প্রতিরক্ষাকে নিশ্চিত করবে, তা নসাৎ হয়। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সে সময় পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক একটা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ বলে মনে হয়েছে। এই ঘটনার ফলে সামরিক অফিসার ও সাধারণ জনগণের মনে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে একটা গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া পাকিস্তানের পক্ষে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পশ্চিমা শক্তিবর্গের বিরোধের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আবার নিজেকে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটা সংঘাতে জড়িয়ে ফেলছে, যে রকম ঘটনা এক জেনারেশন আগেও একবার ঘটে গেছে।

পশ্চিম এশিয়ায় তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার কারণে পাকিস্তানকে একটা ভাড়াটে গ্যারিসন হিসেবে ব্যবহার করার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি কয়েক বছরের মধ্যেই আবার পরিবর্তিত হয়ে যায়। আসলে ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মে ইরাকে কাসেমের সামরিক অভ্যুত্থান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রয়োজনীয়তাটা ফুরিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা' ঠিক করতে "বাগদাদ চুক্তি"-ভুক্ত শক্তিগুলো (ইরাক বাদে) আঙ্কারাতে মিলিত হয়। এটা পরিষ্কার হয়ে উঠল, এই রণনীতির যা মূল লক্ষ্য, সেই পাকিস্তানী ও তুরস্কের বাহিনী দিয়ে হস্তক্ষেপ করানোর ধারনাটা আসলে অবাস্তব। এই সময়ে পাকিস্তান নিজেও তখন দেশের ভেতরে সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে এক রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি। এর পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা। ৬০-এর দশকে

যুক্তরাষ্ট্রের এ অঞ্চলের রণনৈতিক কৌশল পুনর্বিবেচিত হলো এবং তাতে পাকিস্তানকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না দিয়ে কিছুটা অগৌরবের সাথেই পাশে ঠেলে রাখা হলো। পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তা হারাতে চায়নি। আরো একবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থটাই ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব পেল। এক্ষেত্রে অবশ্য ১৯৫৮ সালে ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে সঙ্কট দেখা দেয় তার সুযোগে এবং ভারতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র নেহেরু কর্তৃক গৃহীত কিছু কিছু নীতি পাল্টানোর জন্যে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বড় বড় বৈদেশিক বিষয় থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সরিয়ে এনে তার আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে দেশে একটা গণ-আন্দোলনের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল, যে নির্বাচন ঘটলে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্র এতদিন নিজেদের যে শক্তি গড়ে তুলেছিল, তা' নসাৎ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত। ফলে ১৯৫৮ সালের যে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এলেন সে অভ্যুত্থানের পেছনে সামরিক বাহিনী সমর্থন যোগাল।

সামরিক শাসনের ধরন

তবে এটা খুব দ্রুত ধরে নেওয়া ভুল হবে যে ওই সময়টাতে জেনারেলরা ও যুক্তরাষ্ট্র (সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে যে দু'জনের ভূমিকা প্রায়ই এক সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে) পাকিস্তানে একটা সামরিক শাসন চাইছিল। বস্তুতঃ নতুন সরকার নিজেদের স্থিতিশীল করে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় এক মাস সময়ের মাঝেই সেনাবাহিনীকে আড়ালে সরিয়ে নেয়। সামরিক অভ্যুত্থানের পর পরই একজন বেসামরিক অফিসার আজিজ আহমেদকে সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল এবং একজন উপ-সামরিক আইন প্রশাসক (এই প্রথম একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে এই পদ দেয়া হলো) হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রথম কয়েক সপ্তাহ সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদের সেনাবাহিনীর অফিসাররা অসংগঠিত ও অসমন্বিতভাবে "দেশ-গঠন"-এর কাজে উঠে পড়ে লাগে। ১৯৫৮ সালের ১১ই নভেম্বর সকল সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের- "বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা" প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে বলা

হয়। কিছু নতুন রাজনৈতিক কাঠামো ও সংবিধান শুরু করার আগে পর্যন্ত সামরিক আইন সামরিক আদালতসমূহ বজায় রাখা হয়, তবে তা' করা হয় নিতান্তই অন্তর্বর্তীকালীন একটা ব্যবস্থা হিসেবে। সরকারের প্রশাসন বেসামরিক হাতেই রয়ে যায়।

কিন্তু প্রতিতুলনায় ১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকারের পতন ও ক্ষমতা জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর আমরা দেখি যে সেনাবাহিনী অতীতের চেয়ে আরো বেশী বেশী করে জড়িত হয়ে পড়ছে। সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের (এইচ কিউ, সি এম এল এ) দপ্তরে ও দুই প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসকের প্রধান দপ্তরে সহ-প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বেসামরিক অফিসারদের সমান্তরালে সামরিক অফিসার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এটাও খুব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। সেনাবাহিনীর ভেতরেও এভাবে জড়িয়ে পড়ার প্রশ্নে বিতর্ক ছিল। সেনাবাহিনীর ভেতরে পরিবর্তনের একটা র‍্যাডিকাল চাহিদা যে জন্ম নিচ্ছে সে ব্যাপারে রক্ষণশীল জেনারেলরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারা এই চাপ ঠেকানোর জন্যে মাঝখানে একটা বেসামরিক সরকার তৈরীর পক্ষে ছিলেন।

কিন্তু আর কিছু জেনারেল ছিলেন যারা আরো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তারা নির্বাচনের পক্ষে ও একটা "প্রতিনিধিত্বশীল" সরকার গঠনের পক্ষে ছিলেন কারণ তারা সামরিক অফিসারদের নগদ কিছু বেশী লাভের আশায় দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাটা নষ্ট করতে চাইছিলেন না। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই হয়তো স্যামুয়েল হান্টিংটন ও তার মার্কিন সহকর্মীদের অনুমোদন পেয়েছে ও তাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছে,[২১] যে সহকর্মীদের অনেকেই তখন ছিলেন পাকিস্তানের উপদেষ্টা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে যুক্তিটা ছিল যে কোনো সরকারই নিপীড়নের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। প্রত্যেক সরকারেরই টিকে থাকার জন্য একটা কার্যকরী বৈধ কাঠামো প্রয়োজন। তারা আশা করেছিলেন যে দুর্বল রাজনীতিবিদ ও বিভক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের দ্বারা সৃষ্ট একটা বেসামরিক সরকার, গত দুই দশক ধরে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্র যে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে, তাকে খুব একটা খর্ব করতে পারবে না। তাছাড়া সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী ইত্যাদি পদে না থাকাই ভালো কারণ জনগণের ক্ষোভ তাহলে তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ভূমিকা শুধুমাত্র নিপীড়নকারীরই নয়। পাকিস্তানের সমস্যাসঙ্কুল ইতিহাসে অনেকসময়ই সরকারকে বৈধ করতে সে এগিয়ে এসেছে, যে ভূমিকাটা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব ও শক্তি দ্বারা তা' পালন করে আসতে পেরেছে। ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত মূলত: দুটি কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটা বিশেষ মোহ ছিল। প্রথমত: ভারতের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের কারণে এই ভয় ছিল যে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীই মূল ভরসা। পাকিস্তানের সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্র এই ক্ষেত্রটা থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্যে ভারতের সঙ্গে টেনশন বৃদ্ধি করে রাখে। দ্বিতীয়ত: রাজনীতিবিদ ও আমলাদের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি। জনগণকে তাদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে আসতে হতো এবং তাদের কুকীর্তিসমূহকে তারা অবলোকন করতে পারত। কিন্তু সেনাবাহিনী জনগণের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ছিল না এবং দেশের একমাত্র দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সুনাম ছিল। অবশ্য এখন আর তার সে সুনাম নেই। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই সব বিষয়ের কারণে সঙ্কটের সময় সেনাবাহিনী এক ধরনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নেমে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে।

তবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আমলে সেনাবাহিনীর এই বৈধকরণের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে তার পরাজয়ের পর তা' একেবারেই নষ্ট হয়। ১৯৭০ সালে যে সেনাবাহিনী নির্বাচন হতে দিল তার কারণ সে আশা করেছিল যে দলমতে বিভক্ত রাজনীতিবিদরা পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে এবং সে রেফারী হিসেবে তার ভূমিকা অব্যাহত রাখতে পারবে। কিন্তু ফলাফল ভিন্ন রকম হলো। সেনাবাহিনীর আশার বিপক্ষে যেয়েই আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া ভোট পেল এবং জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। এই ফলাফল ছিল সেনাবাহিনীর কাছে পুরোপুরি অনভিপ্রেত এবং তা নস্যাৎ করার জন্য তারা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও সেনাবাহিনী এই সত্যটি আবার হজম করতে পারছিল না যে একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে পি পি পি (পশ্চিম) পাকিস্তানে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু সেনাবাহিনীর নামে আর শাসন করতে সক্ষম না হওয়ায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সেনাবাহিনীর অফিসাররা পিপিপি নেতা ভুট্টোকে

সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হয়। এই সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী দেশ চালাতে "রাজনৈতিকভাবে অক্ষম" হয়ে পড়ে। পিপিপি—কে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ এটা বোঝায় না যে সেনাবাহিনী ও পিপিপি-র মধ্যে কোনো রাজনৈতিক আঁতাত হয়েছিল। বরং বিপরীতে পিপিপি-র কাছে সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় এ দুইয়ের সম্পর্কের মাঝে টেনশনের সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ও তাকে আরো দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ভুট্টো তাঁর পছন্দমত সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতি ও অবসর ঘটান এবং গণবিক্ষোভ ঘটলে তা দমনে সেনাবাহিনীর উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণে একটা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে ভুট্টো ও পিপিপি-র পতনের জন্যে তার বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশ ও শেষ পর্যন্ত ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সেনাবাহিনী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে এসেছে। জেনারেল জিয়াউল হক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা দখল করার আগে পর্যন্ত সেনাবাহিনী নিজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পর্যায়ক্রমে বাড়াতে থাকে। ভুট্টোর বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত "জনপ্রিয়" আন্দোলন গড়ে তোলা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল করার মাঝে কয়েকটি মাস পার হতে দেয়া হয়। আর প্রথমে ক্ষমতা নেয়াও হয় মাত্র তিন মাসের জন্যে, তাও নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ঘটনা চলতে থাকার মাঝেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যান্য সামরিক সরকারের তুলনায় এবারই প্রথম সামরিক সরকার নিজের কোনো বৈধ পরিচয় খুঁজে পেল না এবং জনগণের উপর নির্মম নিষ্পেষণ চালানোর ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। কিন্তু সরকারের একটা বৈধ উৎস প্রয়োজন। আর তাই সে নিজে নিজেই পাকিস্তানে একটা ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী রাজনীতি গড়ে তোলার মিশন গ্রহণ করল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীও একটা রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা ছাড়া আর শাসনকার্য চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

বেসামরিক প্রশাসনের ভুমিকা

পাকিস্তানের প্রথম দুই দশকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বেসামরিক প্রশাসনেরই হাতে ছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তা' নিয়ন্ত্রণ করত ও সেনাবাহিনীকে করত সহযোগিতা। ব্রিটিশ ভারতের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সর্বোচ্চ

ব্যক্তিরা, এই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই সি এস)-এর অফিসাররা ছিল, নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থান বজায় রাখতে দৃঢ়বদ্ধ একটা সামাজিক গ্রুপ। পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ঐ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এবং এ ঐতিহ্যকে তা আরো বৃদ্ধি করেছে। ব্রিটিশ শাসনকে একটি ক্ষুদ্রসংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারদের উপর একটা "ইস্পাত কাঠামোর"-র উপর নির্ভর করতে হতো, যে এলিট গ্রুপটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করে চলত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের এবং জেলা প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি এই সীমিত ক্যাডারদের জন্য রক্ষিত থাকত এবং এইভাবে তারা গোটা প্রশাসনিক কাঠামোটাকে নিয়ন্ত্রণ করত। এর নীচে ছিল "প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস" (পি সি এস) যা ছিল স্থানীয় ও নেটিভদের চাকুরী এবং তাদেরকে প্রশাসনের নীচের দিকে নিয়োজিত করা হতো।

পাকিস্তানে আই সি এস ধারাকে "সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান" নাম দিয়ে পুনরুজ্জীবীত করা হলো। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে এরকম ৫০০-এর মত অফিসারের কর্তৃত্বে ছিল গোটা প্রশাসন ও প্রায় ৫০০,০০০ সরকারী কর্মচারী বাহিনী।[২২] সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস (যার মধ্যে প্রায় বারো ধরনের চাকুরী ছিল) পরীক্ষায় সবচে' ভাল ফল করেছে এমন ২০ জনকে প্রতি বছর সি এস পি করা হতো। এদের বয়স ২১ থেকে ২৪-এর মধ্যে হওয়ার কথা। এদের পরবর্তী প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক নির্বাচন করত পাবলিক সার্ভিস কমিশন যার সদস্যরাও ছিল সি এস পি অফিসার এবং যার স্বায়ত্তশাসন খুব যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হতো। এটা ছিল একটা জোটবদ্ধ গ্রুপের মত, কারণ এর সদস্যসংখ্যা ছিল যারা ওই বয়সসীমায় ওই পরীক্ষা ও নির্বাচনে টিকে গেছে শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অন্য কোনো অবস্থাতেই এই সার্ভিসে আর কাউকেই নিয়োগ করা হতো না।

সি এস পি অফিসারদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো এদের ঐক্য। এই সার্ভিসের সকলেই একযোগে তাদের সার্ভিসের কোনো সদস্যের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেত, তা'সে ন্যায়-অন্যায় যাই করুক না কেন, এবং একজন সি এস পি অফিসার সর্বদাই এই সমর্থন লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত থেকেই কোন কাজ করত। এই শক্তির গোপন চাবিকাঠি ছিল এখানেই এবং তা জনগণের "অভিভাবকত্বে"-র একধরনের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত

হতো। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জোয়ারের সময় নিজেদের সম্পর্কে ঔপনিবেশিক আই সি এস অফিসাররাও ওইরকম মনে করত।[২৩] রাজনীতিবিদদের মনে করা হতো প্রতারক, ক্ষমতালিপ্সু ও স্বার্থপর এবং সি এস পি-রাও ওই একই ধারা অনুসরণ করে চলে। "একাডেমীটা প্রকৃতই প্রতিটি শিক্ষানবিশীর উপর তার ছাপ ফেলতে সক্ষম হতো। তা' আমলাতন্ত্রের উপর দেশ-ভাগ উত্তর যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়, তা' মোকাবিলায় যথেষ্ট মজবুত করার ক্ষেত্রে এদের মাঝে "অভিভাকত্বে"-র ধারণা খুব ভালভাবেই ঢোকাতে সক্ষম হয়"—এই কথাগুলো লিখেছেন পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের একজন বড় সমর্থক ব্রাইবান্টি।[২৪] তিনি আরো বলেন :

"১৯৪৭ সালের ভাঙ্গা-গড়ার ফলশ্রুতিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে পাকিস্তান ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্যকে ধারণ করবে। এই ঐতিহ্যটায় যে একটা বিজাতীয় উৎস রয়েছে, মুসলমানরা যে একদিন এই ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেছিল, এটা যে পরাজিতের উপর বিজয়ীদের শাসন চালানোর লক্ষ্যেই করা, এই উপমহাদেশের দু'টি ভিন্ন ভূ-খন্ড নিয়ে দ্রুত একটা জাতি গঠনের সময়ে এ সব বিষয় মোটেই বিবেচনা করা হয়নি।"[২৫]

জাতি আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব দ্বারা গঠিত হয় না। ব্রাইবান্টি যেটা দেখাচ্ছেন তা' হচ্ছে ঔপনিবেশিক-উত্তর যুগেও ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ধারাবাহিকতা।

আমি দেখাতে চেয়েছি যে শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ক্ষমতা ছিল সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্রের হাতে। প্রথম দশকটাতে আমলাতন্ত্র বেশী কর্তৃত্বশালী ছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যা তখন সংসদীয় গণতন্ত্রের কারণে বাহ্যিকভাবে ক্ষমতায় ছিল, তার উপর আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব করতে পারার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে আমলাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ অফিসার ও মন্ত্রীদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় রয়েছে যা ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ১৯১৯ সালের ভারত সরকারের শাসনধারার "দ্বৈতশাসন" পদ্ধতি অনুযায়ী (যে পদ্ধতিতে প্রথমবারের মত প্রাদেশিক পর্যায়ে ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী নেয়া হলো) ১৯২১ সাল থেকে এই বিষয়টি শুরু হয়। ভারতীয় মন্ত্রীদের প্রাদেশিক সরকারের খুব কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলিরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো ভারতীয় মন্ত্রীর অধীনে কাজ করা অনেক ব্রিটিশ আমলার কাছেই অপমানজনক মনে হয়েছে। কেউ কেউ প্রতিবাদে পদত্যাগও করে। এই প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে ১৯১৯

সালের ভারত শাসনবিধি পাশ করার আগে ভারতীয় মন্ত্রী ও আই সি এস অফিসারদের "উপযুক্ত সম্পর্ক"-এর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক হয়। এইসব আলোচনায় ঔপনিবেশিক শাসকদের একধরনের অভিভাবকসুলভ ধ্যান-ধারণা ফুটে ওঠে। এটা পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয় যে ভারতীয় মন্ত্রীরা উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে শিক্ষানবিশ হবে যেসব অফিসাররা তাদের স্বায়ত্তশাসনের কলাকৌশল শেখাবে! একজন মন্ত্রী ও সচিবের মধ্যেকার প্রচলিত সম্পর্কটা এখানে উল্টে দেয়া হলো। এরকম একটা বিধান রাখা হলো যে মন্ত্রী ও সচিবের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিলে সচিব মন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে সরাসরিভাবে গভর্ণরের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মন্ত্রীর এ বিষয়ে আর কিছুই বলার রইবে না। ভারতীয় মন্ত্রীরা প্রায়শঃই তাদের সচিবদের ঔদ্ধত্য ও অসহযোগী মনোভাবের কথা জানিয়ে অভিযোগ পেশ করে এসেছে। তাদের এই অভিযোগ দেখার জন্য যেসব কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল তারা সমস্যার মূল বিষয়টা এড়িয়ে গেছে। রাজনীতিবিদদের কোনো ছাড় দেয়া হয়নি এবং তাদেরকে অশ্রদ্ধা জানিয়ে চলার ক্ষমতা আমলাদের থেকেই গেল[২৬], যে ধারাটি উপনিবেশোত্তর-কালেও চলে আসতে থাকে।

ভারতে, যেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদেরকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করতে পেরেছিল, সেখানে ঔপনিবেশিক ধারায় সরকারী কাজকর্মে পরিবর্তন আনা হয়। অবশ্য ভারতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাটাকে একটু বেশী খাটো করে দেখানো হয় যে বিষয়টি ভাম্রি খুবই পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন।[২৭] পাকিস্তানে যেহেতু ঔপনিবেশিক ধারাটাই বজায় রইল, সেইহেতু নামে-মাত্র মন্ত্রীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হ্রাস করার জন্য আমলাদের বাহ্যিক কোনো ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন পড়ল না। তারা আগের মতই চলতে থাকল। পাকিস্তান প্রসঙ্গের একজন বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক কেইথ ক্যালার্ড লেখেন :

"পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হ্রাস পাবার পথে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করে করে একে অন্যকে ক্ষমতা-হীন করে তুলছে। ধর্মীয় ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জনের দাবী করছে কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই অর্জন করতে পারেনি। বস্তুতঃ দেশটা চলছে আমলাদের দ্বারা যারা স্বাধীনতার আগেও অনেক কাজ করে এসেছে। নেপথ্য ভূমিকায় রয়েছে সেনাবাহিনী।"[২৮]

অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে আমলাতন্ত্র স্বাধীনতার আগে যা করেছে সেটা এখন আর তাকে করতে হচ্ছে না। তা' হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হতো। উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র নিজেই একটা শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হলো।

কিভাবে আমলাতন্ত্রের দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রের অধীনস্থ রইল, কিভাবে কেন্দ্রের আমলারা রাজনীতিবিদদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে এ সম্পর্কে সাঈদ প্রচুর তথ্য[২৯] সংগ্রহ করেছেন। তবে কেন্দ্রে সুদৃঢ় ক্ষমতা থাকার কারণেই যে আমলাতন্ত্রের পক্ষে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এ বিষয়ে সাঈদের পর্যবেক্ষণ দুর্বল।

সংসদীয় সরকার অনুযায়ী যা পাকিস্তানে শুধু নামে মাত্রই ছিল, আমলাতন্ত্রের একটা বিভক্ত চরিত্র ছিল। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ছিল আলাদা এবং মাথার উপরে ছিল একজন সচিব। এর উপরে সরকারের কাজ সমন্বিত রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রীরা ও মন্ত্রীসভা ছিল। এই রাজনৈতিক ভিত্তিটি ছাড়া আমলাতন্ত্রের ঐক্য রইত না। তবে আমলাতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর লক্ষ্যে পাকিস্তানে একটা বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হলো। এ পদ হচ্ছে পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল পদটি। অত্যন্ত শক্তিশালী এই পদের অধিকারী আমলাটি মন্ত্রীসভার আওতার বাইরেই প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সচিবের ওপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন। তিনি সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবদের একটা কমিটির নেতৃত্ব করতেন যে কমিটি একটা সর্বোচ্চ-মন্ত্রীসভা (super cabinet) হিসেবে সরকারী নীতি নির্ধারণ ও সমন্বিত করত এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে একটা ছায়ায় পরিণত করে ফেলল। সরকারের ওপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব চূড়ান্ত হলো।

১৯৭০-এর দশকে পিপিপি সরকারের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সামরিক আমলাতান্ত্রিক অলিগার্কি আর কখনোই তেমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি। পিপিপি যেসব সংস্কারে হাত দিল তার মধ্যে সবচেয়ে নিয়ামক ও কার্যকরী সংস্কার ছিল আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠন। ১৯৭৩ সালের আগস্টে সে প্রশাসনিক সংস্কারের দাবী জানায় এবং দ্রুত তা' বাস্তবায়ন শুরু করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল সি এস পি-দের দুর্গ ভাঙ্গা। একটা ক্যাডার সার্ভিস হিসেবে সিএসপি-প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। সকল ক্যাডারদের "অল পাকিস্তান ইউনিফাইড গ্রেড"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো এবং উপযুক্ত গ্রেড অনুযায়ী সকল অফিসারকে নিয়োগ করা হলো। সরকারের উঁচু পদে ওঠার ব্যাপারটি সবার

জন্যই উন্মুক্ত করা হলো যা এতদিন সি এস পি-দের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। ঐক্যবদ্ধ এই গ্রেডে সরকারী কর্মচারীদের মোট ১৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়, যেমন জেলা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদদের একটি গ্রুপ, বিদেশবিষয়ক একটি গ্রুপ, হিসাব সংরক্ষণ গ্রুপ, পুলিশ গ্রুপ ইত্যাদি। তবে এটা লক্ষ্য রাখা হয় যে এসব গ্রুপ যেন আবার পুরোপুরি স্বতন্ত্র হয়ে না পড়ে। আর সেই জন্যে অফিসারদের বিভিন্ন গ্রুপে বদলীর ব্যবস্থা রাখা হয়। আমলাতন্ত্রের আগের দিনের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করার জন্য "বাইরের প্রবেশ" অর্থাৎ অন্য পেশা ও ব্যবসায়ীদের থেকেও ব্যক্তিবর্গকে এনে সরাসরি সরকারের সিনিয়র পদে নিয়োগ করা হয়। পাকিস্তানের সি এস পি নিয়ন্ত্রিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এর ফলে ভেঙ্গে পড়ে।

এইসব সংস্কারের ক্ষেত্রে ভুট্টোর সহযোগী হিসেবে কাজ করে ভিকার আহ্‌মেদ। ভিকার আহ্‌মেদই প্রথম অ-সি এস পি অফিসার, যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী হন। সিনিয়র অফিসারদের নিয়োগ ও বদলীর দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। (পিপিপি সরকারের আমলে তিনি প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন এবং ভুট্টো এই ব্যাপারে খুব সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন)। ভিকার আহ্‌মেদ অবশ্য ভুট্টোর পূর্ববর্তী সরকার ইয়াহিয়া সরকারের সময় এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সি এস পি-দের ক্ষমতা খর্ব করার একটা চিন্তা ইয়াহিয়া সরকারেরও ছিল। কিন্তু বাস্তবে এ লক্ষ্যে সে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ভুট্টো পাবলিক সার্ভিস কমিশনসমূহের উপর সি-এস পি-দের প্রভাবকেও নসাৎ করলেন। তিনি তাঁর অনুগত বিচারপতি ফয়জুল্লাহকে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করলেন। তাঁর ক্ষমতা খুবই সীমিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নিজেই সিনিয়র অফিসারদের অস্থায়ীভাবে ছয়মাসের জন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন যা পরে কমিশন দ্বারা "আইনসিদ্ধ" করে নেয়া হতো।

তবে এটা একটা বিতর্কের বিষয় যে এইসব কাঠামোগত পরিবর্তন পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সমাজে একটা পৃথক সত্ত্বা হিসেবে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে কতখানি ধ্বংস করতে পেরেছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর মত অনুযায়ী, এটা সামান্যই হয়েছিল, কারণ দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান সামরিক সরকারের অধীনে আমলাদের দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্য আবার সীমাহীন হয়ে পড়েছে।

আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে ভুট্টোর পদ্ধতি ছিল নির্মম। তার সময় আইন করা হয়েছিল যে ২৫ বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর যে কোনো অফিসারকেই কোনো উপযুক্ত কারণ দর্শানো ছাড়াই অবসর গ্রহণ করানো যেতে পারে। অতীতে তা করা হতো নানারূপ সরকারী জটিল পদ্ধতি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সি এস পি-দের কর্তৃত্বাধীন)-এর অনুমোদনক্রমে। কিন্তু ভুট্টোর আমলে প্রতিটি সিনিয়র আমলার মাথার উপরেই খড়্গ ঝুলতে থাকে।

কিন্তু বর্তমান সামরিক সরকারের আমলে অবস্থাটা ঘোলাটে। সি এস পি পদ্ধতি সরকারীভাবে নাকচ করে দেয়া হলেও এদের মধ্যে পুরোনো ঐক্য-বন্ধনটা রয়ে গেছে এবং এটা পরিষ্কার যে তারা তাদের ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে এনেছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো, যদি না তা সেনাবাহিনীর অফিসারদের কব্জায় না গিয়ে থাকে, তো সি এস পি (প্রাক্তন) অফিসারদের হাতেই তা' গেছে। বিচারপতি আনোয়ার হকের অধীনে একটি সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয় যার রিপোর্ট ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। সি এস পি অফিসাররা এই রিপোর্ট অপছন্দ করে এবং এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন এবং প্রকাশিত হওয়াটাকেও ঠেকিয়ে রেখেছে। নিজের পক্ষে তা বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, যেমন, সিনিয়রিটি প্রসঙ্গে সরকারের আগের নীতির পরিবর্তন। বাইরে থেকে যাদের সরকারী চাকুরীতে ঢোকানো হয়েছিল তাদেরকে আবার বের করে দেবার স্বার্থ সামরিক সরকারেরও ছিল এবং এদের অনেককেই বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তবে সি এস পি-দের পক্ষে অসুবিধাজনক দিকগুলি হচ্ছে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও একটি বাদে সকল প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধান বর্তমানে সামরিক অফিসাররা। সকল স্তরের পদের শতকরা ১০ ভাগ সেনাবাহিনীর সদস্যদের (সেনাবাহিনীর সার্ভিসে রয়েছে কিম্বা বাইরে রয়েছে) সংরক্ষিত করা হয়েছে। এটা সেই "বাইরের প্রবেশ"-এরই একটা ঘটনা যা থেকে কিন্তু আবার বেসামরিক লোকজনদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। যদিও পুরোনো সি এস পি-রা এখনও টিকে রয়েছে এবং তাদের ক্ষতি অনেকখানি পুষিয়ে নিয়েছে, তবুও কোনো অবস্থাতেই তারা অতীতের মত এখন আর রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রধান শক্তি নয়। সামরিক বাহিনী আমলাতন্ত্রের দুর্গ ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছে।

এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে যেহেতু নতুন করে আর সি এস পি অফিসার গ্রহণ করা হচ্ছে না, ফলে সি এস পি অফিসারদের সংখ্যা কালক্রমে কমে যাবে এবং তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আগের মত প্রভাব বজায় রাখতে পারবে

না। কিন্তু বর্তমানে সি এস পি-র উত্তরাধিকার হিসেবে জেলা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (ডি এস জি) নামে একটা নতুন সার্ভিস কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। সি এস পি-রা এই ঘটনাকে উৎসাহিত করছে এবং এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে এরা সি এস পি-দের সম্ভাব্য উত্তরসূরী হতে যাচ্ছে। অবশ্য ডি-এস-জি অফিসারদের মধ্যে সি এস পি-দের উচচপদে অগ্রাধিকারের অধিকার তেমন নেই, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যও তেমন মজবুত নয়।

পুরোনো সি এস পি-দের তাদের চাকুরীজীবন শুরু করতে হতো জেলাতে। জেলাতে তার চাকুরীতে সে পৌছনো মাত্রই সে জেলা প্রশাসক (জেলার সকল প্রশাসনের কর্তা) ও কমিশনার (কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত বিভাগীয় প্রশাসনের প্রধান) দ্বারা আমন্ত্রিত হতো এবং এ দু'জন নিজেরাও সি এস পি অফিসারই হতেন। সে যে এই গোত্রেরই একজন এটা তাকে বুঝতে দেয়া হতো এবং সে নিজেও জানত যে পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই সেও ওই পদে পৌঁছবে এবং পরে আরো ভালো পদে, যেমন সচিবালয়ে, যেতে পারবে। কিন্তু ডি এস জি অফিসারদের সে রকম সুযোগ-সুবিধা নেই। শুরু থেকেই তাদেরকে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং পদোন্নতির ব্যাপারে তাদেরকে অনেকক্ষেত্রেই তোষণনীতির উপর ভরসা করতে হয়। ফলে সি এস পি-দের মত ওরকম ঔদ্ধত্যও তাদের নেই।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় সেনাবাহিনীর চেয়ে আমলাতন্ত্রই পাকিস্তানের ওপর বেশী কর্তৃত্ব করত। সেনাবাহিনী তখন মোটেই সুশৃঙ্খল ছিল না। পুরানো ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইউনিটসমূহকে তখন নতুন করে গড়া ও সাজানো হচ্ছিল। অ-মুসলমান অফিসার ও সৈন্যদের ভারতে চলে যাওয়া ও মুসলমান অফিসার ও সৈন্যদের পাকিস্তানে আসায় তাদেরকে উপযুক্ত সামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ ছিল। সেনাবাহিনী তার আভ্যন্তরীন সমস্যা নিয়েই ছিল ব্যতিব্যস্ত। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ-রা ছিল ব্রিটিশ অফিসার।

১৯৫১ সালে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত সিনিয়র জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হলো। তার এই নিয়োগ খুব সুচতুরভাবে ও দক্ষভাবে করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা। ইস্কান্দর মীর্জা নামে সেনাবাহিনীর লোক হলেও মূলতঃ ছিলেন একজন পুরোদস্তর আমলা। সান্ডহার্স্টে আইয়ুব খান ও মীর্জা সমসাময়িক ছিলেন এবং আইয়ুব ছিলেন মীর্জার বন্ধু। আইয়ুব দুর্বল-

চেতা ব্যক্তি ছিলেন এবং তার এই অপরিপক্ক পদোন্নতির কারণে সেনাবাহিনীর চক্রে তার বিরুদ্ধে সৃষ্ট ক্ষোভ তার দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি করেছিল। সে কারণে আইয়ুব জানতেন যে তার পথ বন্ধুর এবং তিনি মীর্জার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ও অনুগত থাকেন। মীর্জার উদ্যোগে সৃষ্ট ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানটা তারা একসাথে মিলেই ঘটিয়েছিলেন। তবে পরে আমরা যা দেখব রাষ্ট্রপতি হিসেবে মীর্জার বিদায় ও আইয়ুব কর্তৃক সেই পদে সমাসীন হওয়া যতখানি না আইয়ুবের উদ্যোগে হয়েছিল (যদিও এ সম্পর্কে বহু গল্প প্রচলিত আছে), তার চেয়ে বেশী হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে, কারণ যেভাবে অভ্যুত্থানটা ঘটল তা' যুক্তরাষ্ট্রের মনঃপূত ছিল না এবং মীর্জাকে তারা একটা রাজনৈতিক বোঝা হিসেবেই মনে করছিল।

পাকিস্তানের সৃষ্টি থেকেই আমলাতন্ত্র ক্ষমতার মূল শক্তি ছিল এই থিওরীর বিপক্ষে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে দেশটির প্রতিষ্ঠাতা ও শাসক দল মুসলিম লীগের প্রধান কায়েদ-এ-আজম জিন্নাহই ছিলেন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের এক-চ্ছত্র অধিপতি। তার দৃঢ় আদেশ-নির্দেশেই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এরকম একটা ছবি অনেকেই দিয়েছেন, যেমন সাইদ।[৩০] কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য জিন্নাহ্‌র নামে যারা কাজ করেছে এবং তাঁর পেছনে সন্নিবেশিত আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, তারাই মূলতঃ প্রচার করেছে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার প্রথম থেকেই জিন্নাহ খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং এই অসুখের কারণেই মৃত্যুবরণ করেন। চতুর্দিকে অসংখ্য সমস্যার সেই দিনগুলিতে তার পক্ষে রাষ্ট্রের হাল ধরা তখন সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি সাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে চেয়েছেন, কিন্তু আবার পড়ে গেছেন।[৩১] ফলে সরকারের কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁকে যেসব অফিসারদের ওপর নির্ভর করতে হতো তারা প্রায় স্বাধীনই ছিল। জিন্নাহ্‌ মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে তাঁর চারপাশে কিছু মেরুদণ্ডহীন লোকজন যোগাড় করেছিলেন যাদের উপরে তিনি নিজেই ভরসা করতেন না এবং তারাও জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য ছিল না। অন্যদিকে জিন্নাহ্‌র সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছিল একজন খুবই করিৎকর্মা ব্যক্তি এবং আমলাতান্ত্রিক শক্তিকে সে সংহত করে। পাকিস্তানের ভবিষ্যতে জিন্নাহ্‌র একটা অনিচ্ছাকৃত অবদান হচ্ছে আমলাতন্ত্রের বিপরীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে খাটো করে যাওয়া।

গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহ্‌র হাতে অসীম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল যা এইসব আমলার হাতকেই আসলে শক্তিশালী করেছে, যারা মন্ত্রীপরিষদ, এমনকি

পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে সহজেই উপেক্ষা করে কাজ করতে পারত। এ সম্পর্কে রাজনীতিবিদরা আপত্তি তুললে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সাংবিধানিক পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে "বর্তমান সংবিধানে সকল ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত। তিনি যা চাইবেন তাই করতে পারেন।"[৩২] ১৯৪৭ সালের "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট"-এর ৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাড়ে সাত মাসের জন্য সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানের সাংবিধানিক পরিষদের যা ভিত্তি সেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, পরিষদের নির্দেশসমূহ, ইত্যাদি পরিবর্তনে সক্ষম। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গভর্ণর জেনারেলের এই ক্ষমতা আরো এক বছরের জন্যে বাড়ানো হয়।

এটা উল্লেখযোগ্য যে এসময়কার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন এই ধারা অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশক্রমে ঘটেছে, পাকিস্তানের সাংবিধানিক পরিষদের নির্দেশে নয়, এবং এই পরিষদের ভূমিকা প্রহসনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশে ১৯৩৫ সালের আইনে একটা নতুন ধারা (৯২ক) যোগ করা হয় যা তাকে "জরুরী" অবস্থার সময় কোনো প্রদেশের সাংবিধানিক কাঠামো স্থগিত রাখা ও তার পক্ষে প্রদেশের গভর্ণর কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী করে। এই সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করা হয়েছে। গভর্ণর জেনারেলের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়াকে অনেকে প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতার হস্তান্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাঈদ লিখছেন যে, "কায়েদে আযম ও তাঁর উত্তরসূরী লিয়াকত আলী খানের বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় আমলাতন্ত্র প্রাদেশিক প্রশাসনের সবটাই নিয়ন্ত্রণ করত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে তাদের ইচ্ছা মাফিক রাজনীতিবিদদের ক্ষমতায় রাখা হতো কিম্বা সরিয়ে দেয়া হতো।"[৩৩] সাঈদ সমস্যাটাকে প্রাদেশিক সরকারসমূহের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন এবং এটা দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারও চালিত হচ্ছিল আমলাদের দ্বারা যারা জাতির পিতার নামে কাজ-কর্ম চালাচ্ছিল।

জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীনকে গভর্ণর জেনারেল করা হলো। যদিও তাঁর পদটার প্রচুর সাংবিধানিক শক্তি ছিল তবুও তিনি নিজে ছিলেন একজন দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি। জনগণের চোখে জিন্নাহ্‌র উত্তরাধিকারী ছিলেন

প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। জিন্নাহ্‌র পরে লিয়াকত আলীই ছিলেন একমাত্র রাজনীতিবিদ যার একটা জাতীয় মর্যাদা ছিল এবং যিনি ইচ্ছা করলে আমলাতন্ত্রের উপরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনোই প্রশাসন কিম্বা অর্থনৈতিক নীতিসমূহে তাঁর প্রভাব খাটাতে যাননি। বিষয়টি তিনি আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। দ্রুত ক্ষয়ে যেতে থাকা মুসলিম লীগ দলের সভাপতি হিসেবে দলটাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেই তিনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁর খুব বেশী জড়িত না হওয়ার আরেক কারণ হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুবই দুর্বল ছিল এবং তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ফাইল-পত্র পাঠ করতে পারতেন না।

যে ব্যক্তিটি আমলাতন্ত্রের তখনকার মূল কর্ণধার ছিলেন তিনি হচ্ছেন সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী।

সরকারের জরুরী সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্তসমূহের সুসমন্বয় করার লক্ষ্যে এই পদটি জিন্নাহ্‌ সৃষ্টি করেছিলেন। এই পদ সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল এই যে, যে কথাটা আমরা আগেও বলেছি, মন্ত্রীসভাকে উপেক্ষা করেই আমলাতন্ত্রের পর্যায়েই সরকারের সিদ্ধান্তে একটা সমন্বয় সাধন করা। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তাঁর দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকারী নীতিতে প্রভাব বিস্তার করতেন। যদিও তিনি আমলাতন্ত্রের মোটামুটি উচ্চপদস্থ অংশটাকে তাঁর সঙ্গে রাখতে পেরেছিলেন, তবুও অন্তত: তাঁর দু'জন সহকর্মী, প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা, যার পেছনে সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল এবং অর্থমন্ত্রী গুলাম মুহম্মদ, যিনি নিজেও ছিলেন একজন পুরোনো সিনিয়র বুরোক্রাট এবং আমলাতন্ত্রের ভেতর যার শক্তিশালী প্রভাব ছিল, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যে তলে তলে তৈরী হচ্ছিলেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর যখন নাজিমুদ্দীন গভর্ণর জেনারেল হলেন, তখন গুলাম মুহম্মদ ক্ষমতা পাওয়ার একটা সফল চেষ্টা নেয়। গভর্ণর জেনারেল হিসেবে তার নিয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তানে আমলাতান্ত্রিক শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়টা শুরু হয়। সেক্রেটারী-জেনারেলের পদটা তুলে দেয়া হয় এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় যা তার আগের ক্ষমতাকে বহুলাংশে হ্রাস করে।

১৯৫১ সালে ইরানে তেল জাতীয়করণ করার ফলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। এই পদক্ষেপে তার

প্রধান দুই ভরসা ছিল গভর্ণর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ ও সেনাবাহিনী-প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের উপর। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে একটা রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করা হয় যার দ্বারা গভর্ণর জেনারেল খুব ত্বরিত গতিতে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে দেন। সঙ্গতকারণেই নাজিমুদ্দীন সরকার এবং বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ্ খান এই পদক্ষেপ পছন্দ করেননি। যে সঙ্কট তাদেরকে বাতিল করে দেয়ার কারণ তা একইসঙ্গে নানারকম রূপ নিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের মার্চে সংখ্যালঘু মুসলিম আহ্‌মেদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ছিলেন, ব্যাপক দাঙ্গা শুরু করা হয়। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে জাফরুল্লাহ্ খানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার জোর দাবী তুলে ধরা হয়। এই দাঙ্গা থামাতে সামরিক আইন জারী করা হলো।

এক আসন্ন দুর্ভিক্ষের ধুঁয়ো তুলে নাজিমুদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে আরেকটা আক্রমণ চালানো হলো। সে বছর গমের ফসল ভাল ছিল না এবং সি আই এ পরিচালিত একটা ব্যাপক প্রচারণা দ্বারা এই অভাবকে একটা দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলে বহুগুণ বর্ধিত করে প্রচার করা হয়। এর ফলে মজুতদারী বেড়ে যায় এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকে। মরিয়া হয়ে নাজিমুদ্দীন সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চায়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেই প্রতিশ্রুত খাদ্য সাহায্যের চালান আটকে রাখা হয় যতদিন না ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে নাজিমুদ্দীন সরকার বিতাড়িত হলো। এক সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত খাদ্যশস্য পরবর্তী বছরে পাকিস্তানে বাম্পার ফসল না হওয়া পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। দুর্ভিক্ষের প্রচারণাটি যে একটা ধোঁকাবাজি ছিল তা' এই বিষয়টা থেকে পরিষ্কার যে খাদ্য পরিস্থিতি আর খারাপ হয়নি এবং প্রতিশ্রুত খাদ্য-সাহায্য এসে না পৌঁছলেও পাকিস্তান ও বছরটা ভালোভাবেই কাটিয়ে দিতে পেরেছিল।[৩৪] কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারকে আতঙ্কিত করা ও সরিয়ে দেয়া সম্ভব হলো। গভর্ণর জেনারেল নাজিমুদ্দিনের বদলে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন।

যে কায়দায় নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হলো তা' থেকে একটা জিনিষ আবারো পরিষ্কার হয়ে উঠল যে শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও প্রথাসমূহকে আমলাতন্ত্র থোড়াই পরোয়া করে। বস্তুতঃ বরখাস্ত হবার মাত্র দিন কয়েক আগেও আইন পরিষদ ব্যাপক ভোটে

তাঁর পেশকৃত বাজেট অনুমোদন করেছিল। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশে বরখাস্ত করা হলো। এর শাসনতান্ত্রিক বৈধতার কথা বাদ দিলেও এটা পরিষ্কার হলো যে ক্ষমতা বাস্তবে কোথায় ছিল। পরিষদের ভূমিকা যে খুবই বশ্যতামূলক ছিল তা' এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয় যে এই ঘটনার পরপরই অধিবেশনে বসলেও তা' এর বিরুদ্ধে কিছুই বলেনি। উপরন্তু খুবই অনুগতভাবে তারা গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক ক্ষমতায় বসানো নতুন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ভোট দিল। নতুন প্রধানমন্ত্রীর জন্যে মন্ত্রীদেরও গভর্ণর জেনারেলই ঠিক করে দিলেন, এমনকি তাদের কাকে কি দপ্তর দেয়া যায় সেটাও তিনিই ঠিক করলেন। এইভাবে, অবশেষে, পাকিস্তানে আমলাতন্ত্র অপ্রতিরোধ্য এক রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করল।

গভর্ণর জেনারেল এবং পরে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বহুবার মন্ত্রী বানালেন আবার বরখাস্ত করলেন এবং প্রতিবারই পার্লামেন্টের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেতে তাদের কোন সমস্যাই হলো না। বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা এ সময়কালটাতে যে নানারকম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও সরকারের উত্থান-পতন ঘটেছিল সে ব্যাপারে বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে এই সমস্ত পরিবর্তনের একটা বিষয় সর্বদাই চোখে পড়বে, তা হচ্ছে, এই সব পরিবর্তনে গভর্ণর-জেনারেল ও পরে রাষ্ট্রপতির নির্ধারক ও কর্তৃত্বের ভূমিকা। আর এই দু'টি পদে আসীন ছিলেন গুলাম মোহাম্মদ ও পরে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা, দু'জনেই আমলা। তাদের ক্ষমতা মূলতঃ নির্ভরশীল ছিল আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর ওপর। রাজনীতিবিদদের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল কোয়ালিশনের উপর তারা নির্ভরশীল ছিলেন না এবং তাদেরকে তারা ক্রমেই একটার পর আরেকটা সঙ্কটের দিকে টেনে নিয়ে যান।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনের নাটকীয় ফলাফল গভর্ণর-জেনারেলের আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। নির্বাচনের এরকম ফলাফল "যুক্তফ্রন্ট"-এর মত সরকারের কাছেও প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল। "শাসক দল" মুসলিম লীগ যেখানে বিজয়ের আশা করছিল সেখানে তারা পেল ৩০৯ আসনের মধ্যে মাত্র ১০টি আসন। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর ইউনিটসমূহকে দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করা হলো। অবস্থার গতিধারা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে জেনারেল

ইস্কান্দার মীর্জাকে ঢাকায় পাঠানো হলো। নবগঠিত "যুক্তফ্রন্ট" সরকারকে বরখাস্ত করা হলো এবং মীর্জার অধীনে "গভর্ণরের শাসন" কায়েম করা হলো। শুরু হলো ব্যাপক নিপীড়ন ও ধর-পাকড়।

পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের তীক্ষ্ণ রায় সাংবিধানিক পরিষদের সদস্যদের সাহসী করে তোলে এবং তারা কর্তৃত্বশালী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা স্বাধীন ভূমিকা নিতে সচেষ্ট হয়। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে তারা গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে পরিষদে কিছু সাংবিধানিক সংশোধনীর প্রস্তাব আনেন। কিন্তু এইসব সংশোধনী কার্যকরী করার আগেই গভর্ণর-জেনারেল "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করলেন, সাংবিধানিক পরিষদ বাতিল করলেন এবং পূর্ণ ক্ষমতা কবজা করলেন। অবশ্য গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক এরকম "অভ্যুত্থান"-এর বৈধতা নিয়ে সুদীর্ঘ বিতর্ক হয় এবং তা' কোর্টেও বিচারের জন্যে আসে। কিন্তু আমরা যেটা দেখাতে চেষ্টা করছি তা' হচ্ছে সামরিক-আমলাতন্ত্রের চক্রের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর জেনারেলের অসীম ক্ষমতার বিষয়টি, যে ক্ষমতাবলে তিনি মন্ত্রী পরিষদের প্রধান এবং পার্লামেন্টের উপর সহজেই তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দিতে সক্ষম। এটা সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সামনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসহায়ত্ব তুলে ধরল। গভর্ণর জেনারেল আরেকটা নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে এই মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হলেন (কিন্তু একইসঙ্গে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদটি বজায় রেখেই) এবং জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী হলেন। এই-ই প্রথম সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্র "প্রত্যক্ষভাবে" ক্ষমতা দখল করল।

সাংবিধানিক পরিষদের অনুপস্থিতিতে নতুন সরকারের বিকল্প কোনো উৎস প্রয়োজন ছিল যেখান থেকে তার সরকারকে বৈধ রাখার আইনগত ভিত্তি পাবে। আমলারা এতদিন যে "অভিভাবকত্বে"-র কথা বলে এসেছিল, আজ যখন তারা নিজেরাই সরাসরি সরকারী ক্ষমতায়, তখন দেখা গেল যে, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও জনগণের দুর্ভোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের চেয়ে তারা কিছুমাত্র কম নয়। ফলে সেই "অভিভাবকত্বে"-র তত্ত্বও আর টিকল না। নতুন কোনো বৈধ ভিত্তি পাওয়া এই সরকারের জন্যে জরুরী হয়ে পড়ল।

গভর্ণর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খানের শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে সেনাবাহিনীর নামে ক্ষমতা

গ্রহণের আহ্বান জানালেন। ইস্কান্দার মীর্জার পরামর্শ অনুযায়ী আইয়ুব খান তা' করতে অস্বীকৃতি জানালেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে গভর্ণর-জেনারেল কেন আইয়ুব খানের কাছে এ রকম একটা প্রস্তাব দিতে গেলেন? কারণ সরকার তো ইতিমধ্যেই সামরিক বাহিনীর সমর্থন পেয়েই গেছে, এমনকি জেনারেল আইয়ুবও তো এই মন্ত্রীসভারই একজন সদস্য? আসলে যেটা চাওয়া হয়েছিল তা' হচ্ছে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতীকীভাবে ক্ষমতা "দখল" যাতে সেনাবাহিনীকে জাতির এই দুর্দিনে জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক ও রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ১৯৫৪ সালের ১২ই নভেম্বর লণ্ডনের "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উৎসাহদাতা ইস্কান্দার মীর্জা যিনি নিজে একজন আমলা হয়েও রাজনীতিবিদদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর শিল্পটা ভালোই রপ্ত করে নিয়েছিলেন, এই আইডিয়াটা যে মোটেই পছন্দ করেননি, তা' ব্যক্ত করেছেন। তিনি বললেন যে, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নেই। ইতিমধ্যে মীর্জা "শক্তমানব" হিসেবে বেরিয়ে এসেছে (তবে সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের শক্তিশালী সমর্থন থাকলে সেটাই স্বাভাবিক)। কিন্তু মীর্জা কোনো এক ধরনের সাংবিধানিক কাঠামোই হয়তো বেশী পছন্দ করত, যদিও সে এটা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছিল যে, শাসনতন্ত্র যাতে বেশ কর্তৃত্বশালী ক্ষমতা তার হাতে এনে দেয়, এটাই সে চায়। কিছুদিন ধরে সে "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র"-র কথাও বলাবলি করছিল।

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহ দ্বারা একটা নতুন সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচিত করা হয় এবং তা' একটা সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে যা ১৯৫৬ সালে শেষ হয়। ইস্কান্দার মীর্জা যিনি নিজেকে এতদিনে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছেন, হলেন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এর পরে যে সময়কালটা পার হলো তা' হচ্ছে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাল, অবশ্য তা দেশজুড়ে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি ছিল না। মীর্জা একজনের পর একজনকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করা শুরু করলেন এবং আমলাদের ষড়যন্ত্র দেশটির রাজনৈতিক জীবনে সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ল। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারী করার সময় মীর্জা তার ভাষণে বলেন যে, "গত তিন বছর ধরে দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আমি একটার পর একটা কোয়ালিশন সরকার গঠনের চেষ্টা নিয়েছিলাম। আমার নিন্দুকেরা আমার এসব প্রতিটি প্রচেষ্টাকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নামে

অপপ্রচার চালিয়েছিল... "। একটার পর একটা "সংসদীয়" সরকারকে ক্ষমতায় বসানো ও সরানোয় তার নিজের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে এ এক চমৎকার বক্তৃতাই বটে।

১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান তাই কোনো ক্ষমতা "দখল"-এর ব্যাপার ছিল না, কারণ অভ্যুত্থানের দুই নায়ক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান ইতিমধ্যেই ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেই ছিলেন। এটা ছিল সংসদীয় কাঠামো ও রাজনীতিবিদদের বিতাড়ন যারা এই সংসদীয় কাঠামোর মাঝে দেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আমলাতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে ক্রমশঃই একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিল। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সাল দুটিতে দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটেছে এবং ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের রায়টাকে যদি আমরা নির্দেশিকা হিসেবে ধরি, তা'হলে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে যেসব পুরোনো রাজনীতিবিদ আমলাতন্ত্রের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত হতে দিয়েছে, তারা আর পার্লামেন্টে আসন পেত না। নির্বাচনকে বারবার পেছানো হতে থাকে এবং একটা "সঙ্কট" সৃষ্টি করার চক্রান্ত চলতে থাকে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরের "সামরিক" অভ্যুত্থান দ্বারা সৃষ্ট সরকারটি যথার্থই ছিল একটি সামরিক সরকার। ইস্কান্দার মীর্জা, একজন আমলা, রাষ্ট্রপতি রয়ে গেলেন এবং জেনারেল আইয়ুব হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং একই সঙ্গে রইলেন দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও। আরেকজন আমলা, আজিজ আহমেদ সরকারের চীফ সেক্রেটারী হিসেবে এবং একজন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দেশের দৈনন্দিন প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৫৮ সালের ৮ই অক্টোবর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হলো। নবনিযুক্ত বেসামরিক চীফ সেক্রেটারী ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আটটি মন্ত্রণালয়ের আটজন বেসামরিক সচিব এই পরিষদের সদস্য ছিলেন যারা প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রভার গ্রহণ করলেন। প্রাদেশিক সরকারগুলো প্রাদেশিক গভর্ণরদের অধীনে কাজ করতে থাকে। প্রাদেশিক গভর্ণরদের ক্ষমতা আগের মতই শক্তিশালী থাকে। আর সামগ্রিকভাবে সামরিক আইন প্রশাসকরা "আইন-শৃঙ্খলা" পরিস্থিতির ও সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতগুলির দায়িত্বে ছিল যেগুলোর ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। আমলাতন্ত্রের মধ্যেও কিছু ঝাড়াই-বাছাই করা হলো এবং সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর কিছু সরকারী কর্মচারীকে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে বরখাস্ত করা হলো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামরিক সরকারের

কিছু কিছু যথেচ্ছ পদক্ষেপ যেমন জিনিষপত্রের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা কিংবা জনগণের সঙ্গে ব্যবহার ও নৈতিকতার মান উন্নয়নের চেষ্টা ইত্যাদি পদক্ষেপ সাময়িক কিছু উন্নতি ঘটালেও কিছু কিছু ক্ষোভ ও অসন্তোষেরও সৃষ্টি করে। পাশাপাশি সৃষ্টি করে কিছু প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলাও। অবশ্য অল্প কয়েক দিন পরই প্রশাসনকে আবার বেসামরিক হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৫৮ সালের ১১ই নভেম্বর "বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা" করার কাজ থেকে সকল সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নেয়া হয়। তবে সামরিক আইন ও সামরিক আদালতগুলি বলবৎ থাকে।

পাকিস্তানী বুর্জোয়ারা এই সামরিক অভ্যুত্থানে বিশেষ খুশি হয়নি। দুর্নীতি উচ্ছেদের এই সরকারের হুমকী-ধামকি ও ঝপাঝপ পদ্ধতি তাদেরকে কিছুটা আশঙ্কিত করে। অবশ্য ট্যাক্স-ফাঁকি কিংবা বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ মালিকানা ইত্যাদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যিকারের পদক্ষেপ খুব সামান্যই নেয়া হয়েছিল। (প্রতীকধর্মী কিছু পদক্ষেপ মাত্র নেয়া হয়)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে খুব একটা খুশী ছিল না। এটা পরিষ্কার ছিল যে আসন্ন নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে কাইয়ুম মুসলিম লীগ, যে দু'জনই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জিতে যাবে। তার নির্ভরযোগ্য মিত্ররা যদি গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আসতে পারত সেটাই যুক্তরাষ্ট্রের সবচে' কাম্য ছিল। এই সামরিক অভ্যুত্থান সেই সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল।

যুক্তরাষ্ট্র এই নতুন সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান ছিল। দেশটি তখন রাজনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। একটা স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা মীর্জার ছিল না। কিন্তু সরকারের স্থায়িত্বটা মেট্রোপলিটন পুঁজির জন্যে বিশেষ জরুরী এবং তারা জানে যে সামরিক বাহিনী-সৃষ্ট স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং এটাই সবচে' শেষ বিকল্প। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট ও এই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পলিসি পরিকল্পনাকারী সি. বি. মার্শাল "সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন"[৩৫]-এর বিপদ সম্পর্কে তাদের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। নির্বাচন বাতিল হওয়ার ভেতরে তিনি বিপদের আঁচ পেলেন। কারণ তার মতে মীর্জার অধীনে কোনো স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। তবে এই সামরিক অভ্যুত্থানও

মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই এবং আর অভ্যুত্থান-পূর্ব অবস্থাতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। নতুন সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে আবার উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। মার্শাল তার পাঠকদের আশ্বস্ত করছেন এই বলে যে, "আমি শুধুই গণতন্ত্রের কথা বলিনি। যেটার উপর আমি জোর দিতে চেয়েছিলাম তা হচ্ছে ঐক্যমত, কর্তৃত্ব ও একটা নীতি গ্রহণ যা এমন কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবে যার দ্বারা দেশটি কোনো একটা অবস্থায় পৌঁছতে পারবে।"

দুই সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগটা নিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাসচিব ম্যাকলরয় কর্তৃক পাকিস্তানে চারদিনের এক ঝটিকা সফরের পর পরই ১৯৫৮ সালের ২৪শে অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হলো এবং তার জায়গায় জেনারেল আইয়ুব খানকে ক্ষমতায় বসানো হলো। আইয়ুব নিজে নিজে কখনোই এই সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ নিতে পারত না। কারণ সে সর্বাঙ্গীনভাবেই ছিল মীর্জার সৃষ্টি। এরপরে সে হয়ে উঠল, আরো বেশী প্রত্যক্ষভাবে, তার আমেরিকান প্রভুদের সৃষ্টি। তার আমেরিকান উপদেষ্টা ও দেশীয় অফিসাররা তার সরকারের বেসামরিক প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরী করতে তৎপর হলো এবং তথাকথিত "মৌলিক গণতন্ত্র" আবিষ্কৃত হলো, যা ছিল ১৯৬২ সালের সংবিধানের ভিত্তি, যে ভিত্তির উপরই আইয়ুব সরকার দাঁড়িয়ে ছিল।

এই "মৌলিক গণতন্ত্র' অনুযায়ী "মৌলিক গণতন্ত্রী" নামে পরিচিত স্থানীয় গ্রাম ও শহরের পরিষদসমূহের সদস্যদের ভোটে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবে। গোটা কাঠামোটাই স্থানীয় পরিষদসমূহের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল। স্থানীয় পর্যায়ে এসব পরিষদের কাজ আমলাতন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র এসব স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। স্বার্থটা দু'পক্ষেরই। এসব লোকদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার দরকার ছিল আবার উচচ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিচ্ছিন্ন বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য সামরিক-আমলাতন্ত্রের চক্রের কাছেও এদের প্রয়োজন ছিল। এই পদ্ধতিটা আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও নানা রকম খেলানোর ক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত ছিল। আবার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকার কারণে (যা ভূ-স্বামীদের কর্তৃত্বাধীন) সরকারের ওপর একটা বৈধতার আলখাল্লাও বজায় রাখা সম্ভব ছিল। এই পদ্ধতির সঙ্গে

জড়িত ব্যাপক দুর্নীতি ও এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের অত্যাচারী ভূ-স্বামীদের হাতকে আরো শক্তিশালী করার কারণে এই ব্যবস্থা সর্বমহলেই ঘৃণিত হলো এবং যে আন্দোলনে অবশেষে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটল সে আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য দাবীই ছিল "মৌলিক গণতন্ত্র" বাতিল করা। যদিও পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকারও স্থানীয় পর্যায়ে এই রকম একটা ব্যবস্থারই পুনঃ-প্রবর্তনের চেষ্টায় রত, তবুও আইয়ুব খানের আমলে এই ব্যবস্থা এত দুর্নাম কুড়িয়েছে যে ভিন্ন আর একটা নাম দিয়ে জিয়া সরকার এই ব্যবস্থা যে "মৌলিক গণতন্ত্র"-এর ব্যবস্থা থেকে পৃথক, সেরকম কিছু দেখাতে চাইছে। কিন্তু এর কাঠামো মূলতঃ একই এবং একই ধরনের লোকজনই এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

উন্নয়নের দশ বছর ও কাঠামোগত ভাঙ্গন

আইয়ুব খানের তথাকথিত "উন্নয়নের দশ বছর"-এ দেশীয় বুর্জোয়া ও ভূ-স্বামীরা উভয়েই আরো সমৃদ্ধশালী হয়েছে এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজি অতীতের অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশী অনুপ্রবেশ করেছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষাপটে কঠোর শ্রম-আইন দিয়ে ও নির্যাতন চালিয়ে মজুরী কমিয়ে রাখা হয়। বুর্জোয়ারা আরো ধনী হলো এবং গ্রামাঞ্চলে গমের উচ্চ মূল্য ও উৎপাদনের উপকরণের উপর ভর্তুকী দেয়ার ফলে যাদের কৃষিপণ্য বাজারজাত করার অবস্থা ছিল সেই সব ধনী কৃষক ও ভূ-স্বামীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হলো। তুলনামূলকভাবে, গরীব কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ল।[৩৬] শ্রমিক-শ্রেণীর করুণ হাল এই তথ্য থেকে ফুটে উঠবে যে ১৯৫৪ সালের মজুরী শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে ১৯৬৬ সালে শতকরা ২৫ ভাগে নেমে আসে।[৩৭] আর যদিও অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা তুলনা করার মত তুলনীয় পরিসংখ্যান তেমন নেই, তবুও এটা পরিষ্কার যে স্বল্পবেতনভুক কর্মচারীদের অবস্থা আরো খারাপই হয়েছে। তাছাড়া, যেহেতু ভূ-স্বামীরা করমুক্ত ছিল এবং শিল্পপতিরা নানারকম কর মওকুফ পেত, ফলে সাধারণ জনগণের উপর করের বোঝা তীব্র হলো। সরকারের উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনাসমূহের জন্য অর্থ যোগানোর লক্ষ্যে সাধারণ ভোগ্যপণ্যের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর খুবই বেশী বাড়ানো হলো। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমরা এসবের ফল ফলতে দেখি। এই সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে এক তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং জনগণ এ সরকারের পতন ঘটায়।

১৯৬৮-৬৯ সালের শীতকালের গণ-অভ্যুত্থান পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা কাঠামোগত ভাঙ্গনের জন্ম দেয়। এর ভলে গুণগতভাবে একটা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর আগে পর্যন্ত পাকিস্তানে র‍্যাডিকাল ও বাম "আন্দোলনসমূহ" মূলতঃ বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক ও ছাত্রদের সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল এবং মূল জনগোষ্ঠী থেকে তা বিচ্ছিন্ন ছিল। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা একটা গণ-আন্দোলনের উদ্যোগ নেয়ার মত অবস্থায় ছিল না। আবার যখন প্রয়োজন পড়ল তখন এই আন্দোলনের একটা কার্যকরী নেতৃত্ব ও গতিধারা প্রদান করতেও তারা সক্ষম হলো না। দক্ষিণপন্থী দলসমূহ এই আন্দোলনের চরিত্র থেকে শঙ্কিত হলো এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই স্যাবোটাজ করতে সচেষ্ট হলো। কিন্তু সর্বত্রই, শহর এবং গ্রামাঞ্চলে, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকেরা এই আন্দোলনে অংশ নিল এবং স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বও প্রদান করল। একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তি বেরিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো—একদম নীচের পর্যায়ের ক্যাডাররা, যারা কর্মী এবং সংগঠক। এইসব রাজনৈতিক কর্মীরা রাজনৈতিকভাবে সরল ও অজ্ঞ। তাদের মূল সম্পদ হচ্ছে তাদের পরিপূর্ণ সততা ও কমিটমেন্ট। পার্টির সদস্য হলে যে উদ্দীপনা ও আগ্রহ তারা পেত, তার অভাবে এদের অনেকেই পরে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এদের অনেকেই ভুট্টো ও পিপিপি-র বাগাড়ম্বরে এই দলে সমবেত হয় এবং অন্য অনেকে রাজনৈতিক-ভাবে আরো সচেতন হয়ে আরো বামে ঝোঁকে। এদের ব্যাপক একটা সংখ্যা বামপন্থী দল ও গ্রুপে সংগঠিত হয়। পাকিস্তানে একটা বাম বিকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা বেশ সক্রিয়। বাম পার্টি ও গ্রুপগুলোর অতীতের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী সাধারণ মানুষের মধ্যে ভিত্তি রয়েছে। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শ্রমিক-শ্রেণী একটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, যদিও ১৯৭০-এর দশকে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন বেশ কমে যায়।

দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির অযোগ্যতা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্যোগ নিতে পারার মত সংগঠিত বাম শক্তির অনুপস্থিতির ফলে কর্তৃত্ব পুনরায় সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্রের হাতেই চলে যায়। আইয়ুবের পতনের পর সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এলেন। আইয়ুব খান যেসব সামাজিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করতেন, ইয়াহিয়া সরকারও সেটাই করত এবং তার সরকারে বিবাদমান বিভিন্ন শক্তির একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণও ছিল। পাকিস্তান সম্পর্কে বেশ জানেন-শোনেন এমন একজন ব্যক্তি মেজর

জেনারেল (অবঃ) ফজল মুকিম খান বলেন যে, "আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজেকে সেনা-বাহিনী থেকে আলাদা করে নিয়ে বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা দেশ চালাতে থাকেন। অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খানও সেনাবাহিনীকে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন, কিন্তু আইয়ুব যা করেননি তা করলেন, সেটা হচ্ছে নিজেকেও সকল রকম বেসামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল-লেন।"[৩৮] এমনকি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের হেড কোয়ার্টারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো না। যারা ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তারা এই বক্তব্য রাখেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মার্কিন উপদেষ্টাদের নিয়ে একটা গোপন চক্র কাজ করত। ফজল মুকিম খানের মতে এই চক্রটা ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত-ভাবে পছন্দ কিছু অফিসারদের নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি লেখেন :

"সাধারণভাবে রাষ্ট্রপতির চারপাশে জমায়েত অফিসারদের দলটি সম্পর্কে সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসাররা কিছুটা উপহাস করে একটা "গোষ্ঠী" (coterie) হিসেবে আখ্যায়িত করত। এর সঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশা-সকের সদর দপ্তরকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। ১৯৭০ সালের জুলাইয়ের দিকে সদর দপ্তরের সিনিয়র অফিসাররা এই অভিযোগ তোলেন যে কোনো ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ও জাতীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ তাদের অজ্ঞাতেই রাষ্ট্র-পতি তাঁর গোষ্ঠীর উপদেশ অনুযায়ী নিচ্ছেন। তাদের মতে এই গোষ্ঠী সদর দপ্তরের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এক ধরনের মাফিয়ায় তা পরিণত হয়েছে এবং এদের কারণে রাষ্ট্রপতির কাছে ভেড়া যাচ্ছে না।"[৩৯]

সেনাবাহিনীর ভেতর থেকেও ইয়াহিয়া খানকে একটা র‍্যাডিক্যাল সংস্কার করার চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে। "র‍্যাডিক্যাল" শব্দটি এক্ষেত্রে সচে-তনভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জঙ্গী দক্ষিণপন্থীরা এবং রয়েছে পপুলিস্ট একটা ধারা কিন্তু যার রাজনৈতিক অবস্থানকে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এরা নৌবাহিনী প্রধান ভাইস-এডমিরাল এহসানের পেছনে সমবেত হয়। উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সকল অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার কারণে সংস্কারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়ার একটা ভালো অবস্থানে তিনি ছিলেন। অন্যদিকে ছিলেন দেশের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী মানুষ, উপ-প্রধান আইন প্রশাসক নুর খান যিনি ভূ-স্বামী শ্রেণীর স্বার্থের একজন গোঁড়া প্রতিনিধি ছিলেন। নুর খান সকল অ-অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় তার এ ব্যাপারে কাজ করার তেমন

সুযোগ ছিল না। পরস্পরবিরোধী এইসব শক্তিসমূহের ভেতরে যুদ্ধবাজদের ও তার নিজের মধ্যে একটা নামমাত্র বেসামরিক সরকারকে রেখে, ইয়াহিয়া ও তার চক্রটি, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এগিয়ে যেতে চাইছিল। আমলাতন্ত্রকে তার পুরোনো ভূমিকায় আবার অধিষ্ঠিত করা হলো। এহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর করে সরিয়ে দেয়া হলো। এইভাবে তার হাত থেকে অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলো নিয়ে নেয়া হলেও তার নতুন অবস্থান থেকেই এহসান পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে বিভিন্ন ইস্যুতে সংগ্রাম চালান, বিশেষ করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়। অন্যদিকে নুর খানকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করা হলো। তার এই নতুন অবস্থান থেকে নুর খান ভূ-স্বামী শ্রেণীর স্বার্থ ভালোই দেখতে পারছিল, কারণ ভূমি-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ছিল প্রাদেশিক সরকারের আওতাধীনে। কখনো কখনো সে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করত, অবাঞ্ছিতভাবেই অর্থনৈতিক কমিটির কোনো মিটিং-এ এসে উপস্থিত হতো (এ ধরনের একটা মিটিং-এ আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম) এবং গমের দামের মত বিষয়গুলিতে মেরুদণ্ডহীন পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের বিপরীতে গিয়ে তার নিজের মতামত চাপিয়ে দিত। সেনাবাহিনীতে যেসব র‍্যাডিক্যাল ও সংস্কারপন্থী লোকজন ছিল তাদেরকে সহজেই বিচ্ছিন্ন ও পদানত করে রাখা হয়েছিল, তবে জোয়ানদের মধ্যে এদের পরিমাণ বেশ বড় থাকায় এদেরকে মানিয়ে চলতে হতো। কর ফাঁকি ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে ঘাপলা-বাজি করার কারণে ইয়াহিয়া খান কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কিছু অকার্যকরী (অবশ্যই প্রতীকী অর্থে) ব্যবস্থা নেয়। একইভাবে বিভিন্ন অপ-রাধের কারণে ৩০২ জন সরকারী কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এদের প্রায় সবাইকেই পুনরায় চাকুরীতে বহাল করা হয় কিম্বা তেমন কোনো শাস্তি প্রদান ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হয়। সরকারের রূপটা ছিল সামরিক, কিন্তু ইয়াহিয়া খান ব্যাপকভাবে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এটা আশা করা হয়েছিল যে ইয়াহিয়া (ও তার "চক্র") প্রতিশ্রুত নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সৃষ্ট খণ্ড-বিখণ্ড একটা পার্লামেন্ট তৈরী হবে এবং পূর্বের মতোই সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্রই আবার সালিসের ভূমিকা পালন করতে পারবে। কিন্তু বাস্তব ফলাফল সবাইকে চমকে দিল। কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে

জয়লাভ করল। শুধুমাত্র একটি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সকল আসনেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করল এবং জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি, পশ্চিম পাকিস্তানে এক অপ্রতিরোধ্য অবস্থান অর্জন করল। পূর্ব-পাকিস্তান কেন্দ্রিক আওয়ামী লীগ সরকার সেনাবাহিনীর স্বার্থের প্রতি হুমকীস্বরূপ ছিল, কারণ তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে সেনাবাহিনীর ব্যয় কমিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি করতে চাইত। ওই রকম একটা সরকার পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারদের পদোন্নতি ঘটাত যা পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের আরো বেশী পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। পূর্ব পাকিস্তানীরা কৃষি আয়ের উপর আয়কর ও ভূ-স্বামীদেরকে ভর্তূকী কমিয়ে দেওয়ার কথা বললে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূ-স্বামীরা আতঙ্কিত বোধ করে। অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী শ্রেণীগুলির মধ্যে শুধুমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীটিই বরং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া মানিয়ে চলতে রাজী ছিল, কারণ এতে তাদের স্বার্থ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাজারটা বজায় রাখার জন্যে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করাও তাদের জন্যে খুবই জরুরী ছিল। এই রকম এক প্রেক্ষাপটেই ১৯৭১ সালের সঙ্কটটা শুরু হয় যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশে পরাজয়ের ফলে, পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে শাসন চালানোর বৈধতার প্রশ্নে এক ব্যাপক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। আমরা আগে বলেছি যে পিপিপি সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হলো। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই-ই প্রথম সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্র নিজেদের উদ্যোগ নেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল এবং একজন ক্ষমতাবান নেতার শক্তিশালী এক রাজনৈতিক দলের মুখোমুখি হলো। এর ফলাফল কি ঘটেছিল, তা' আমরা আগেই বিশ্লেষণ করেছি।

পিপিপি স্ব-বিরোধী উৎসের রাজনৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। একদিকে দেশের এক ব্যাপক সংখ্যক র‍্যাডিক্যাল লোকজন, শোষিত ও দরিদ্র জনগণ এবং "বুদ্ধিজীবীরা" পিপিপি-র "রুটি, কাপড় ও ঘর"-এর শ্লোগানে আকর্ষিত হয়ে এই দলটির পেছনে সমবেত হয়। অন্যদিকে পিপিপি দেশের সবচে' প্রতিক্রিয়াশীল কিছু লোকজন, গ্রামাঞ্চলের শক্তিশালী কিছু ভূ-স্বামীর সঙ্গে ঐক্য করে। এদের ভেতরকার সবচে' শক্তিশালীরা পিপিপি-র বিশাল রাজনৈতিক বিজয়ের পর এই দলে যোগ দেয়। স্ব-বিরোধী এইসব শক্তির সমাবেশের ফলে দলটার ভেতরে এক তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল। খুব

দ্রুতই র‍্যাডিক্যাল ও বামপন্থীরা শক্তি হারিয়ে ফেলে ও দক্ষিণপন্থীরা নিজে-দেরকে সংগঠিত করে। পিপিপি-র "জনগণের মঙ্গল" ইত্যাদি জাতীয় বক্তৃতা-টক্তৃতা সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু দলটির ভেতরে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী দুই শক্তির সংঘাত ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি।

পিপিপি সরকার ক্ষমতায় বসা ও কিছু কিছু র‍্যাডিক্যাল পদক্ষেপ নেয়ার পর থেকেই পিপিপি-র মধ্যেকার র‍্যাডিক্যালস্থানীয়রা তাদের অবস্থান হারাতে থাকে। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে নেতৃস্থানীয় র‍্যাডিক্যাল, যেমন অর্থমন্ত্রী মুবাস্সির হাসান, সিনিয়র পার্টিনেতা, যেমন জে. এ. রহিম ও খুরশিদ হাসান মীরকে মন্ত্রীসভা থেকে বিতাড়নের ফলে পিপিপি-র র‍্যাডিক্যাল অংশটা ধ্বংস হয়। অন্যান্যদের, যেমন মিরাজ মোহাম্মদ খানকে আগেই অপসারিত করা হয়েছিল এবং ১৯৭৪ সাল থেকেই ডানদিকে ঝোঁকটা শুরু হয়নি। এঁদের জায়গায় দেশের কিছু ওঁচা প্রতিক্রিয়াশীলদের বসানো হয়। তাই এটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে পিপিপি সরকারের আমলে সবচে' বেশী নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার নিজের দলের র‍্যাডিক্যাল কর্মীদেরই বিপক্ষে। ভুট্টো জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল ও তাদের সমর্থন হারালো। তাই এটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে শ্রমিকশ্রেণী একসময় তাকে সমর্থন যুগিয়ে-ছিল, ১৯৭৭ সালে যখন তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন তারাও আর নিশ্চুপ থাকেনি। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে না গেলেও, তার পক্ষেও তারা পথে নামেনি। তার আত্মগরিমা ও অসূয়া মনোবৃত্তির কারণে ভুট্টো বিভিন্ন সামাজিক শক্তির কাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে সে বুর্জোয়াদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও। তবে তার সবচে' মারাত্মক ভুল হয়েছিল যে সবচে' শক্তিশালী শ্রেণীটার মধ্যে সে একটা ভিত্তি করে নিতে পেরেছিল, সেই ভূ-স্বামীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এটা ঘটেছিল যখন ১৯৭৭ সালের আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভ করতে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়ার আশায় ভুট্টো ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে কৃষি-প্রকল্পজাত শিল্পসমূহ, মূলতঃ তুলা ছাড়ানোর শিল্প এবং আটা কল ও চালকলসমূহ জাতীয়-করণের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনাটা গোপনে নেয়া হয়েছিল এবং যেদিন জাতীয়করণে ঘোষণা নেয়া হয় সেদিন আর তার দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীদের করার কিছুই ছিল না। কেউ যদি পিপিপি সরকারের পতনের চক্রান্ত এঁটে থাকে, এটাই ছিল তার জন্যে আঘাতের মোক্ষম সময়।

কৃষি প্রকল্পজাত শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করে ভুট্টো সেই শ্রেণী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন যে শ্রেণীটা থেকে তিনি সবচে' বেশী সমর্থন পেয়েছেন। তুলা-ছাড়ানো শিল্প এবং আটাকল বা চিনিকলের মালিকরা হচ্ছে তারা যারা ১৯৪৭ সালে হিন্দু ব্যবসায়ীদের দেশত্যাগের পরে জেলা ও সাবডিভিশন পর্যায়ে নিজেরাই কৃষিপণ্য বা "মাণ্ডি"-র মূল ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিল। "মাণ্ডি" ব্যবসা-ব্যবস্থা একটা শক্তি-শালী ও কার্যকরী সংগঠন যা সমস্ত দেশে ছড়ানো ও যার শাখা-প্রশাখা প্রতিটি গ্রাম ও শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাদের শিল্পগুলো ফিরে পাবে এই আশায় তারা ১৯৭৭ সালের পিপিপি বিরোধী আন্দোলনে জোর সমর্থন জানায় এবং প্রচুর টাকাপয়সাও ব্যয় করে। নির্বাচনের রায় নিয়ে যে আন্দোলন শুরু করা হয় তা' ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত এবং "মাণ্ডি"-ব্যবসায়ীরা তাতে খুবই খুশি হয়। আন্দোলনটার বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে আরো চাঙ্গিয়ে তোলার কাজটি সেনাবাহিনী খুব দক্ষতার সঙ্গেই করে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোন্দল ও বিশৃঙ্খল রূপটা সেনাবাহিনী বেশ দীর্ঘদিন ধরেই তুলে ধরার চেষ্টা করছিল এই আশায় যে এতে জনগণের কাছে তার হারানো আস্থাহীনতা হয়তো আবার ফিরে আসবে। একটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ছিল তার স্বার্থের অনুকূল যাতে রাজনীতিবিদদের আলোচনায় ব্যর্থতাটা ফুটে ওঠে। একারণে সেনাবাহিনী কোনো দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষে ছিল না। আসলে এরকম একটা কথা প্রচলিত রয়েছে যে জেনারেল জিয়া এমন এক সময় আঘাতটা হানল যখন পিপিপি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মাঝে সমঝোতা এবং সঙ্কটটার একটা রাজনৈতিক সমাধানে পেঁছানো গিয়েছিল বলে জানা যায়। যাই হোক, জেনারেল জিয়া তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন। তিনি আজও আছেন।

পিপলস পার্টির পতন ও সর্বশেষ সামরিক সরকার

পিপিপি সরকার, শেষের দিকে, এইভাবে অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী তিনটি মূল শ্রেণী ও একই ভাবে নিম্নবর্গের শ্রেণীগুলির কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তবে একসময় একটা গণভিত্তিসম্পন্ন দল হওয়ার কারণে তার নীচের দিকের সংযোগগুলি তখনও বজায় ছিল এবং এরকম ধারণা করা যাচ্ছিল যে একটা অবাধ নির্বাচনে সে আবারো বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই আশঙ্কাটাই সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। যদিও

জেনারেল জিয়ার সরকার অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী ওই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে তবুও তারাই তাকে "পছন্দ" করে ক্ষমতায় আনেনি। উদ্যোগটা সেনাবাহিনীর তরফ থেকেই নেয়া হয়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী এই তিনটি শ্রেণী যেটা চায় তা' হচ্ছে একটি "স্থায়ী" সরকার। প্রথম দু'বছরে তাদের এই সরকারের মেয়াদ সম্পর্ক ঘোর সন্দেহ ছিল, এখনও তা কিছুটা পরিমাণে তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে।

সেনাবাহিনী পুরোপুরিই জেনারেল জিয়ার এলাকা। তার সরকার প্রকৃতই একটি সামরিক সরকার যেটা আইয়ুব বা ইয়াহিয়ার সরকার সম্পর্কে তেমন করে বলা যাবে না। একটা খুবই সঙ্কীর্ণ ও নড়বড়ে ভিত্তির উপর এই সরকার দাঁড়িয়ে আছে। টিঁকে থাকার জন্যে সেনাবাহিনীর উপরই সরকারের সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং যে ঘোর অসৎ উপায়ে এই সরকার তার টিকে থাকার স্বার্থে সেনাবাহিনীকে দুর্নীতিতে আসক্ত করে তুলছে, তা' সিভিল সোসাইটিতে তার অবস্থানের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। এই সরকারের অদৃষ্টপূর্ব নিপীড়ন ও নির্যাতন এটাই প্রমাণ করে যে এ সরকার তার নিজের বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক ভিত্তিই গড়ে তুলতে পারেনি। বিরোধী পক্ষসমূহের মনে এ সরকার যেভাবে ভয় সৃষ্টি করতে চাইছে তা থেকেই তার নিজের জন্য একটা নিরাপদ ও ইতিবাচক সমর্থন জোগাড় করার ব্যর্থতা পরিমাপ করা যায়।

এই সরকারের সবচে' চোখে পড়ার মত বিষয় হচ্ছে সামরিক বাহিনীর লোকজন ও তাদের আত্মীয়-স্বজনকে ন্যাক্কারজনকভাবে নানারকম সুবিধা প্রদান বাড়িয়েই চলা। সামরিক অফিসারদের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে এবং এর অনেকটাই তারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছে। সামরিক অফিসার ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বেসামরিক প্রশাসন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনে বেসামরিক কর্মচারীদের হটিয়ে দিয়ে চাকুরী দেয়া হচ্ছে, যা কর্মচারী শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে। ব্যবসায়ীরা প্রায়শঃই দেখছে যে তারা সামরিক অফিসার বা তাদের আত্মীয়দের পার্টনার হিসেবে না নিলে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পারমিট-পাচ্ছে না। সামরিক আইন প্রশাসনে নিয়োজিত সামরিক অফিসাররা বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে ঘুষ ভাগাভাগি করছে। সামরিক অফিসারদের এহেন দুর্নীতি, এমনকি সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি করছে। পেশাদার সৈনিকেরা একটা যুদ্ধের বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনীর উপর এসবের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। এদের কেউ কেউ একে

চীনের বিপ্লবের আগে কে এম টি সেনাবাহিনীর অধঃপতিত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করছে। একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেনাবাহিনী ছেড়ে অনেকে আমলাতান্ত্রিক চাকুরী নিচ্ছে, কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। সৈন্যরা তাদের সেনাবাহিনীর পেনশনের জন্যে অপেক্ষা করার চেয়ে এখনই টাকা বানিয়ে নিতে চায়। একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই সেনাবাহিনী হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে।

অবশ্য এই সরকার তার রাজনৈতিক ভিত্তি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। তারা দক্ষিণপন্থী কিছু রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় যা এই সরকারের জনপ্রিয়তাহীনতাকে তুলে ধরে। কোনোরকম রাজনৈতিক বৈধতা না থাকার কারণে জিয়া সরকার তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করায় ক্ষেত্রে একটা নতুন দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর সে দাবী হচ্ছে পাকিস্তানে একটা ইসলামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা।

তবে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে এই সরকারের অক্ষমতার ব্যাপারে মৌলিক কোনো সংস্কারে এই সরকার হাত দিচ্ছে না। তারা কিছু কিছু অপরাধের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। "সুদ-মুক্ত ব্যাঙ্ক"-এর নামে তারা এক প্রহসন করেছে, যার মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাঙ্কসমূহে (জাতীয়করণকৃত) একটা স্থায়ী সুদের পরিবর্তে অর্থলগ্নকারীরা মুনাফার অংশটা পেয়ে থাকে ; বাদবাকী সব ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম আগের নিয়মেই চলছে। এই সরকার একটা ইসলামী কর হিসেবে "জাকাত"-এর প্রবর্তন করেছে, তবে তা' করেছে শুধুমাত্র বিদ্যমান করসমূহের একটা বাড়তি উপাদান হিসেবে। একটা ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার বিনিময়ে আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থাটার কাঠামো পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই উঠছে না। আর ধর্মীয় বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ের কারণে "জাকাত"-এর ব্যাপারেও সমস্যা রয়েছে। যেমন, শিয়াদেরকে রাষ্ট্রকে "জাকাত" প্রদানের হাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আরেকটি কর, "উশর" (tithes)-এর প্রস্তাব পাশ করতে সরকার সুদীর্ঘকাল সময় নিচ্ছে। এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের আওতায় যতখানি যেতে পারে তার সীমানা পর্যন্ত পেঁৗছে গেছে। এ কারণেই দেখি অর্থনীতির ইসলামীকরণ সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, ইসলামীকরণ একটা ধীর ও সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া।

তবে একটা ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের প্রচারণা একটা উল্টো প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করছে। এমন সব আশা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে যা পূরণ হবার নয়। পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশই তাদের গত ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের ইসলামী কথাবার্তা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা জানে যে, যে প্রতিশ্রুতি ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গরা দিয়ে থাকে, সেই একটা ভালো সমাজের বদলে, বরং তার উল্টোটাই হয়ে থাকে। তারা বরং আরো সুনির্দিষ্ট শ্লোগান যেমন পিপিপি-র "রুটি, কাপড় ও ঘর" ইত্যাদির পেছনে সমবেত হতেই বেশী পছন্দ করবে। তবে ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ অল্প কিছু মানুষ এসব ধর্মীয় শ্লোগানে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে বসে এবং পরে হতাশ হয়। এসব শ্লোগান তাদের আশা বাড়িয়ে দেয়। তাদের আশা যত বাড়ানো হয়, হতাশ হওয়ার পরিমাণটাও সেরকমই বেশী ঘটে। "ইসলামী মতাদর্শ পরিষদে"-র বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পদত্যাগ করেছেন এবং বলেছেন যে এই পরিষদ একটা লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র এবং ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার কোনো ইচ্ছে এ সরকারের নেই। ইসলামী মতাদর্শকে ব্যবহার করা, যা এই সরকারের নীতি, তা' তার রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বই তুলে ধরছে।

টীকা

১. এই যুক্তি এ. আবদুল মালেক সম্পাদিত "লা'মি দা লা নেশিয়ঁ"-তে (আলজার, ১৯৭৫) এইচ, আলাভীর "আর্মি আ বুরোক্রাটি দা লা পলিটিক্ দ্যু পাকিস্তান" প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

২. এইচ. আলাভী, "দি স্টেট ইন পোস্ট-কলোনিয়াল সোসাইটিজ", "নিউ লেফট রিভিউ" ৭৪, ১৯৭২ ও কাথলীন গাফ ও এইচ. শর্মা (সম্পাদিত) "ইম্পিরিয়ালিজম এণ্ড রেভ্যুলিউশন ইন সাউথ এশিয়া" (লণ্ডন, ১৯৭৩)।

৩. এইচ. আলাভী, "ইণ্ডিয়া ট্রানজিশন ফ্রম ফিউডালিজম টু কলোনিয়াল ক্যাপি-টালিজম", "জার্নাল অব কনটেম্পোরারি এশিয়া," খণ্ড ১০, সংখ্যা ৪, ১৯৮০।

৪. এইচ. আলাভী ও টি. শানিন (সম্পাদিত) "ইনট্রোডাকশন টু সোশিওলজি অব দি 'ডেভলপিং সোসাইটিজ' " (লণ্ডন, ১৯৮২) গ্রন্থের এইচ. আলাভী-র "দি স্ট্রাকচার অব পেরিফেরাল ক্যাপিটালিজম"।

৫. এইচ. আলাভী ও টি. শানিন (সম্পাদিত) "ইনট্রোডাকশন টু সোশিওলজি অব দি 'ডেভেলপিং সোসাইটিজ'" (লণ্ডন, ১৯৮২) গ্রন্থের এইচ. আলাভী রচিত "স্টেট এণ্ড ক্লাশ আণ্ডার পেরিফেরাল ক্যাপিটালিজম"।

৬. আর. ডি. স্টিভেন্স, এইচ. আলাভী ও পি. বার্তোসি (সম্পাদিত) "রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ এণ্ড পাকিস্তান" (হনুলুলু, ১৯৭৬)-এর অন্তর্ভুক্ত এস. জে. বার্কী রচিত "দি ডেভেলপমেন্ট অব পাকিস্তান এগ্রিকালচার"।

৭. আর. ডি. স্টিভেন্স, এইচ. আলাভী ও পি বার্তোসি (সম্পাদিত) উক্ত গ্রন্থের এইচ. আলাভী রচিত "দি রুরাল এলিট এণ্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান", পৃ. ৩৪০।

৮. মাহবুব-উল-হক, "টাইট ক্রেডিটস—এ কোয়ান্টেটিভ অ্যানালেসিস", জন এডলার (সম্পাদিত) "ক্যাপিটাল মুভমেন্টস এণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট" (লণ্ডন, ১৯৬৭)।

৯. ব্যাঙ্কিং কন্ট্রোল (রেস্ট্রিকশন অফ ব্র্যাঞ্চেস) অ্যাক্ট।

১০. মাহবুব-উল-হক, প্রাগুক্ত।

১১. উপরের ৩ ও ৪ নং টীকা দেখুন।

১২. ১৯৫৯ সালের "পাকিস্তান টুডে" ভূমি-সংস্কার সংখ্যায় এই বিষয়টি নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করেছি।

১৩. আলাভী রচিত "এলিট ফার্মার স্ট্রাটেজী এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৪. কেইথ ক্যালার্ড, "পাকিস্তান—এ পলিটিক্যাল স্টাডি" (লণ্ডন, ১৯৫৭), পৃ. ৭৭।

১৫. ১ নং টীকায় উদ্ধৃত ফরাসী তর্জমায় আমি এই বিষয়টি "দি আর্মি এণ্ড বুরোক্রাসি ইন পাকিস্তান" প্রবন্ধে কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

১৬. স্যার জর্জ ম্যাকমান, "দি মার্শাল রেসেস অব ইণ্ডিয়া" (লণ্ডন, এন. ডি.), পৃ. ২৩৩।

১৭. ঐ।

১৮. এই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত আমার প্রবন্ধ "এলিট ফার্মার স্ট্রাটেজী এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান"-এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৯. মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান, "স্টোরি অব দি পাকিস্তান আর্মি" (করাচী, ১৯৬৩), পৃ. ১৫৯।

২০. কর্ণেল এ. এ. জর্ডান, "ফরেন এইড এণ্ড দি ডিফেন্স অব সাউথ-ইস্ট এশিয়া" (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২), পৃ. ৪৫।

২১. হানিংটনের সমালোচনার জন্যে দেখুন এইচ, আলাভী ও টি. শানিন (সম্পাদিত) "ইনট্রোডাকশন টু সোশিওলজি অব দি 'ডেভেলপিং সোসাইটিজ'" (লণ্ডন,

১৯৭২)-এর অন্তর্গত কলিন লেইসের "আইডিওলজি অব ইম্পিরিয়ালিজম স্যামুয়েল হান্টিংটন এ্যাণ্ড দি এণ্ড অব মডার্নাইজেশন থিওরি"।

২২. ১৯৫৫ সালে (ডাক, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্র বাদে) মোট ৪৯০,০০০ সরকারী কর্মচারী ছিল। ১৯৬০ সালে ৩৫৭ জন সিএসপি ছিল এবং এর পর থেকে প্রতি বছরে ২০ জন করে বাড়তে থাকে।

২৩. ফিলিপ উডরাফ, "দি মেন হু রুল্‌ড ইণ্ডিয়া—দি গার্ডিয়ানস" (খণ্ড ২), লণ্ডন, ১৯৫৪।

২৪. রালফ ব্রাইবান্টি, "দি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান—এ থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস"; "সাউথ আটলান্টিক কোয়ার্টারলি", খণ্ড ৮, নং ২; (বসন্তকাল সংখ্যা), পৃ. ২৮১।

২৫. ঐ, পৃ. ২৬৬-৭।

২৬. উদাহরণস্বরূপ মুণ্ডিমান কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে অনেক মন্ত্রীই তাদের সচিবদের এরকম আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কমিটির রিপোর্টে এসবকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। দেখুন, "রিপোর্ট অব দি রিফর্ম ইনকোয়ারি কমিটি", ১৯২৪ (সি এস ডি), লণ্ডন, ১৯২৪।

২৭. সি. পি. ভাম্ব্রি, "বুরোক্রাসি এণ্ড পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া" (দিল্লী, ১৯৭১)।

২৮. কেইথ কালার্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

২৯. কে. বি. সাঈদ, "পাকিস্তান : দি ফর্মেটিভ ফেজ" (করাচী, ১৯৬০) খন্ড ৯ ও ১৬)।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. জিন্নাহ্‌র অসুস্থতা ও মৃত্যুর প্রসঙ্গে দেখুন, হেক্টর বলিথোর "জিন্নাহ্—দি ক্রিয়েটর অব পাকিস্তান" (লন্ডন, ১৯৫৪), পৃ.২০৮-১৬।

৩২. সাঈদের প্রাগুক্ত রচনার ২৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। সাঈদ কিভাবে সাংবিধানিক পরিবর্তনসমূহের দ্বারা ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল সে সম্পর্কে দরকারী বর্ণনাটা গুছিয়ে তুলে ধরেছেন। তবে তিনি এটা লক্ষ্য করেননি যে যারা জিন্নাহ্‌র নাম ভাঙ্গিয়ে কাজ করছিল তারাই ক্ষমতাকে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছিল।

৩৩. সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩।

৩৪. আরো বিশদ বর্ণনার জন্যে দেখুন, এইচ আলাভীর "ইউ. এস. এইড টু পাকিস্তান", "ইকনমিক উইকলি", বিশেষ সংখ্যা, বোম্বে, জুলাই ১৯৬৩।

৩৫. সি. বি মার্শাল, "রিফ্লেকশনস অন এ রেভ্যুলিউশন ইন পাকিস্তান", "ফরেন এফেয়ার্স", খন্ড ৩৭, নং ২, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃ. ২৫৫।

৩৬. এই খন্ডে পুনর্মুদ্রিত এইচ, আলাভীর "এলিট ফার্মার স্ট্র্যাটেজী এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন পাকিস্তান" দেখুন।

৩৭. এ. আর খান. "হোয়াট হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং টু রিয়েল ওয়েজেস ইন পাকিস্তান?" "পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ", খন্ড ৭, সংখ্যা ৩, শরৎ সংখ্যা, ১৯৬৭।

৩৮. ফজল মুকিম খান, "পাকিস্তানস ক্রাইসিস অব লিডারশিপ" (ইসলামাবাদ, ১৯৭৩), পৃ. ২৬।

৩৯. ঐ, পৃ. ২৭।

এজাজ আহ্‌মেদ

পাকিস্তান : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র*

"...জনাব ভুট্টো কর্তৃক সেনাবাহিনী ও পুলিশকে নানাভাবে পুরস্কৃত করা সত্ত্বেও পাকিস্তানে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে। . . .এই নতুন অভ্যুত্থানটা ঠিক সুহার্তো বা পিনোচেটের ধারার হবে না। এর একটা পিউরিটানীয় অবস্থান নেয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ..."ইসলামী জীবনাচরণ"-এর নামে এই সরকার কারখানাসমূহে একটা মধ্যযুগীয় শ্রম আইন চালু করবে; বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে বুদ্ধিবৃত্তির যেটুকু চর্চা অবশিষ্ট রয়েছে তাকে উপড়ে ফেলবে এবং গত পাঁচ বছরে সংগ্রাম করে কৃষকশ্রেণী যেটুকু সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল তা' উলেট দেবে...এবং এরকম কোনো সরকার যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে সন্ত্রাস অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাবে।"[১]

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর ভুট্টো সরকারের স্থিতিশীলতা ধ্বসিয়ে দেয়ার প্রচারণা যখন শুরু হলো, তখন থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে গোপনে অতি-ডানপন্থীদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের ভিত্তি তৈরী করা হচ্ছিল। যে তথাকথিত "গণতান্ত্রিক আন্দোলন" চলছিল তা' অনেকটাই ছিল চিলির আলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে ট্রাক-মালিক বা গৃহিনী ইত্যাদি সমাজের মধ্যস্তরের কিছু অংশের আন্দোলন।[২]

অতি ডান-পন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান

ওই তথাকথিত "গণ-আন্দোলন"-এ যেসব চরম দক্ষিণপন্থী দল নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক স্বরূপটা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। দলগুলো হচ্ছে, জামাত-ই-ইসলামী (এরপর থেকে শুধুমাত্র 'জামাত' নামে উল্লেখিত হবে), জমিয়ত-এ-উলেমায়ে-ইসলাম (জে ইউ আই), মুসলিম লীগ (এম এল) ও তেহ্‌রিক-এ-ইশতেকলাল (তেহ্‌রিক)। তাছাড়া এই "আন্দোলন"-এর দাবীসমূহ থেকেও আন্দোলনটার চরিত্র ফুটে ওঠে।

---

*এজাজ আহ্‌মেদ রচিত 'ডেমোক্রাসী ও ডিক্টেটরশীপ' প্রবন্ধ। —অনুবাদক।

যেমন, এ আন্দোলনের অন্যতম মূল দাবী ছিল সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ ও বেলুচিস্তানে যে সেনাবাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত, সেই সেনা-বাহিনীর অধীনে "মুক্ত ও অবাধ" নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। "আন্দোলনে"-র সামাজিক ভিত্তি ছিল পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচে' পশ্চাৎপদ অংশ ও শহুরে লুম্পেন সর্বহারা শ্রেণী এবং একে সমর্থন যোগায় দীর্ঘদিন আমেরিকার "ইনস্টিটিউট অব লেবার" ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলি দ্বারা লালিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ। এই "আন্দোলনে"-র ফলে উৎপাদন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় যার পরিমাণ ছিল প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার এবং অসংখ্য হত্যা ও মৃত্যু একটা ফ্যাসিস্ট জাগরণের আদর্শ পূর্বাবস্থা স্থষ্টি করে। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাকিস্তানে কার্টার প্রশাসন কর্তৃক যুদ্ধ-বিমান বিক্রি বাতিল, ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ-প্রদান বাতিল এবং পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদানের জন্য অস্থিতি-শীলতা বজায় থাকার অজুহাতে কনসোর্টিয়াম কর্তৃক এমনকি একটা সভা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত করতে অস্বীকৃতি, এই সব কিছুই খুব সময়োচিতভাবে করা হয়। এইসব জিনিষ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ভুট্টো সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপ, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কোন্ন-য়ন, কৃষিজাত শিল্পসমূহ জাতীয়করণ, চাল রপ্তানীতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া স্থষ্টি, ১৯৭৭ সালে দূরদর্শী ভূমি-সংস্কারের ঘোষণা ইত্যাদি দেশের ভেতরে ও বাইরে একটা সম্মিলিত শক্তি-সমাবেশের স্থষ্টি করেছিল যারা ভুট্টো সরকারের পতন ও একটা দক্ষিণপন্থী সরকারী প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। তাই ১৯৭৭ সালের ৫ই জুলাইয়ের সামরিক অভ্যুত্থান, যা ঠিক এই কাজগুলিই করেছিল, তেমন কোনো আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না।

ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম দিকে সামরিক জান্তার সুর খুব নরম ছিল। তারা তাদের কোনোরকম "রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই" বলল এবং ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত জান্তার ক্ষমতায় থাকার যে পনেরো মাস অতিবাহিত হয়েছে, তার মাঝে সে একটি তথাকথিত "বেসামরিক" সরকার নিয়োগ করেছে এবং অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এমন কিছু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে চলেছে যে একটি সামাজিক বিপ্লব, বা যেটি আরো বেশী সম্ভাবনাময়, এই দেশটির খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া ছাড়া, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দেয়ার আর কোনো পথ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বলা হচ্ছে যে ১৯৭৩ সালের সংবিধান এখনও বলবৎ রয়েছে, যদিও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন যে তিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহি করবেন না। সামরিক বিচারালয় ও সামরিক আইন-কানুন দ্বারাই দেশটি শাসিত হচ্ছে যা প্রতিমুহূর্তেই সংবিধানকে অবজ্ঞা করে চলেছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, যার কাছ থেকে বাধা পাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাকে ২৪ ঘন্টার নোটিশে বরখাস্ত করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের অন্যান্য সকল বিচাপতিকে, সামরিক শাসন বৈধকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, নতুনভাবে শপথ পড়ানো হয়েছে।

সাংবিধানিক বৈধতা ও বিচার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদির এই সঙ্কটের পাশাপাশি বেড়ে চলেছে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয়। অবশ্য পাকিস্তানে সর্বদাই শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারটি প্রচলিত ছিল, কিন্তু অতীতের কোনো সরকার কুন্ঠায় তা স্বীকার করত না। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত, হাত-পা কেটে ফেলা ইত্যাদি শারীরিক পীড়নকে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক একটা ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। মূল লক্ষ্য জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা। এই সরকার এরপর থেকে হত্যা করার দৃশ্য টেলিভিশনে দেখানোর কথা ঘোষণা দিয়েছে। এ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা বিশ হাজার থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে বলে জানা গেছে। যদিও ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টিই নিপীড়ন নির্যাতনের মূল লক্ষ্য তবুও অন্যরাও সে বিপদ থেকে মুক্ত নয়। সেনাবাহিনী প্রধান গর্বভরে বলে বেড়ান যে, "সবাই জানে আমি দক্ষিণপন্থী লোক। তাই যারা লিবারেল ও গণতন্ত্রী রয়েছেন তারা যদি তাড়াতাড়ি মধ্যপন্থায় চলে আসেন তবেই সেটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।" তার অভিধানে সব বামপন্থী ও লিবারেলরাই বিপজ্জনক। শত শত শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। যেমন জানুয়ারী মাসে মুলতানের রাজপথেই সত্তর জনকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ফটোগ্রাফারদের সামনেই মহিলাদেরকে হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে একটা তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। যখনই বিরোধীদলসমূহ কোনো রাজনৈতিক বিক্ষোভ মিছিলের পরিকল্পনা করে, তখনই "জামাত"-এর গোপন সংগঠনসমূহ দ্বারা খবর সংগ্রহ করে পুলিশ হাজার হাজার তরুণদের (ইদানীং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মহিলাদেরও) গ্রেপ্তার করে। প্রচার-মাধ্যমের কন্ঠরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য সাংবাদিককে জেলে পোড়া হয়েছে, টেলিভিশন কর্মচারীদের বেত মারা

হয়েছে, বহু পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেগুলো চলছে সেগুলোও কঠোর সেন্সরশীপের অধীনে চালাতে হচ্ছে। দেশের "মতাদর্শগত সীমান্ত" রক্ষার উচ্চকিত ঘোষণা দিয়ে সেনাবাহিনী পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনে স্থায়ীভাবে জাঁকিয়ে বসছে এবং ইসলামী আচার-আচরণ তুঙ্গে উঠছে। তথাকথিত "বেসামরিক সরকার"-এর আইনমন্ত্রী নিয়োজিত হবার প্রাক্কালে দেশের সবচে' প্রতিক্রিয়াশীল আইনজীবী জনাব ব্রোহী বলেন যে, বর্তমান সরকারের কোনো আইনগত বৈধতার প্রশ্ন ওঠে না কারণ এই সরকার একটা ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এসেছে এবং বর্তমান সামরিক সরকার সেই ইসলামেরই রাজনৈতিক প্রতিভূ বলে সে আইনের উর্ধ্বে।

১৯৭৭ সালের মার্চের ঘটনাবলীর সময় অনেকগুলি খারাপ সম্ভাবনার একটি যে ফ্যাসীবাদের আশঙ্কা আমরা করেছিলাম, আজ তা' আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক সত্যে পরিণত হয়েছে। আর এই উপাখ্যানের মূল ব্যক্তি হচ্ছে এক কুলাক পরিবার থেকে আগত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, বর্তমানে স্ব-ঘোষিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক যিনি ১৯৭০ সালের "কৃষ্ণ সেপ্টেম্বর"-এর দিনগুলিতে বাদশাহ হোসেনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রচুর দুর্নাম কুড়িয়েছিলেন।

বর্তমানের এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের মার্কসবাদী গ্রুপসমূহের মধ্যে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে বর্তমানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে ভুট্টো সরকার নিঃসন্দেহে লিবারেল ও "প্রগতিশীল" ছিল এবং যেহেতু বর্তমান গণ-আন্দোলনে ভুট্টো কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, তাই মার্কসবাদী গ্রুপগুলোর উচিত পিপিপির বাম অংশের সাথে মিলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার (ভুট্টো সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা) ব্যাপারে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। এরা বলেন যে ভুট্টো সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে পাকিস্তানকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে এবং পাকিস্তানের বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছে।[৩] অন্যপ্রান্তে রয়েছে সেইসব কমরেডরা যাদের মতে হিটলার ও মুসোলিনীর মতই ভুট্টোও আরেকজন "ফ্যাসিস্ট" এবং শ্রমিকশ্রেণীর উচিত তার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা।* এসব কমরেডের মতে বর্তমান সামরিক জান্তাকে কিছু পরিমাণে সমর্থন যোগানো যায় কারণ তা "ফ্যাসিবাদী"-কে ধ্বংস করেছে।[৪] দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি একেবারেই অগ্রহণীয় হলেও প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীটিও কিছুটা পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের

*এই প্রবন্ধ ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে রচিত। —অনুবাদক।

বিশ্লেষণে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে ভুট্টো কোনো ফ্যাসিস্ট ছিল না এবং তার সরকারের সংস্কারপন্থী পদক্ষেপসমূহ নস্যাৎ করার লক্ষ্যেই চরম দক্ষিণপন্থীরা জুলাইয়ের সামরিক অভ্যুত্থানটি সংঘটিত করে। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে সঙ্কটটার অর্থনৈতিক ভিত্তি, মূল মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রটির বৈধতার বিষয়টিও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান বিশ্লেষণের তাই দুটি লক্ষ্য রয়েছে। প্রথমত: আমরা ভুট্টোর সংস্কারপন্থার স্বরূপ ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করব। দ্বিতীয়ত: সুনির্দিষ্ট সামাজিক সঙ্কটের আলোকে সংস্কারপন্থা ও "ইসলামী ফ্যাসীবাদ" এই দুটি বিষয়কেই বিশ্লেষণ করব। আলোচনায় আমরা ধরেই নিচ্ছি যে পাকিস্তানের বর্তমান সামাজিক রূপান্তরের স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক নয়; গণ-আন্দোলনের ভিত্তিটা হতে হবে ব্যাপকভিত্তিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং অর্থনৈতিক জীবন, বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির গণতন্ত্রায়ণ ছাড়া গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি নিরাপদ হতে পারে না। আমরা অবশ্যই সেইরকম কোনো তথাকথিত "গণতন্ত্র" "পুনঃপ্রতিষ্ঠার" কথা বলব না যা জুলাই সামরিক অভ্যুত্থান ও নিপীড়নমূলক প্রশাসনের জন্ম দিয়েছে (শুধুমাত্র জিয়াউল হককে নয়, গোটা নিপীড়নমূলক প্রক্রিয়াটাকে)। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কারবাদী মডেলের ইতিহাস ও সীমাবদ্ধতাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। এরপরে আমরা সেই সঙ্কটটি, যা এই সামরিক অভ্যুত্থানকে ডেকে এনেছে, এবং একইসঙ্গে, বর্তমান সরকারের শ্রেণী চরিত্রও বিশ্লেষণ করব।

ভুট্টো ও পিপিপি-র পেছনের ইতিহাস

যেহেতু কিছু কমরেড ভুট্টোকে একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও এমনকি বিপ্লবী বলছেন তাই এই তথ্যগুলি আরেকবার স্মরণ করা প্রয়োজন যে ভুট্টো সিন্ধুর অন্যতম বৃহত্তম ভূ-স্বামী পরিবারের সন্তান। তার পিতা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের সামন্তবাদী জুনাগড় রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ ও শহরে প্রচুর স্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের অধিকাংশ যাদের থেকে সৃষ্ট সেই বোম্বের জায়মান মুসলমান বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। এই শ্রেণীভিত্তির কারণেই ভুট্টো বার্কলী ও অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেন। দেশে ফেরার পর তাকে দে- ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর আইয়ুব খানের সামরিক মন্ত্রীসভা

দু'জন বেসামরিক মন্ত্রীর একজন হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং আইয়ুব খানের পরবর্তী সাত বছরে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তার পরবর্তীকালের "ইসলামী সামাজিক গণতন্ত্রে"-র পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার এই ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে পৃথক করে দেখা চলে না।

আইয়ুবের মন্ত্রী হিসেবে ভুট্টো তার নিজস্ব একটা ইমেজ তৈরী করতে সচেষ্ট থাকে। দেশের ভেতরে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে তার দহরম-মহরমটা সে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা র‍্যাডিক্যাল অবস্থা নিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে। সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা ও তেল অনুসন্ধানের একটা চুক্তি স্বাক্ষর করে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকী-করণ করে এবং সুকর্ণোর সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা নেতৃস্থানীয় জোটনিরপেক্ষ দেশ বেন বেল্লার আলজেরিয়া বা নাসেরের মিশরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভের কথা বলে। আইয়ুবের স্বৈরতন্ত্রী সরকারে ভুট্টো নিজের সম্পর্কে একটা শিক্ষিত ভদ্রলোকের ইমেজ তৈরী করে নেয় এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশজুড়ে আইয়ুব-বিরোধী তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই সময় বুঝে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

পিপল্‌স পার্টি নামে ভুট্টো যে দলটি গড়লেন তার একদিকে ছিল র‍্যাডিক্যাল লোকজন যা অধিকাংশই এসেছে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পেটি বুর্জোয়া অংশ থেকে এবং অন্যদিকে ছিল বড় আকারের ভূ-স্বামী শ্রেণী। তবে এই ভূ-স্বামী শ্রেণী পাঞ্জাবের বিশাল ভূ-স্বামী শ্রেণীর বিরোধী ছিল এবং কৃষিতে ধনতন্ত্রায়ণের পক্ষে ছিল। (যে কারণেই ভূমি-সংস্কারের প্রশ্নটি এসেছে, যে প্রসঙ্গটি আমরা পরে আলোচনা করব)। পিপিপি গঠনের কালে এই র‍্যাডিক্যাল পেটি বুর্জোয়ার প্রভাবটাই প্রধান ছিল যা দলটির ঘোষণাপত্রে ফুটে ওঠে, যে ঘোষণাপত্র পরিষ্কারভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী ও একচেটিয়া বিরোধী। এই অংশটি তাদের এই ঘোষণাপত্রকে সমাজতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে সমাজতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করলেও এরা জনগণের চেতনাকে কিছুটা পরিমাণে র‍্যাডিক্যাল করে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপি-র বিজয় রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী একটা অন্যতম শ্রেণী হিসেবে এই পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীটিকে সামনে নিয়ে আসে। (পেটি বুর্জোয়ার অন্য অংশটি অবশ্য নিপীড়নমূলক সংস্থা—সেনা-বাহিনী, পুলিশ, ইত্যাদি কিম্বা মতাদর্শগত সংস্থা—স্কুল, কলেজ, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল।)

তবে পিপিপি-র ভেতরে এই র‍্যাডিক্যাল অংশটি নিজেদেরকে একটা ব্লক হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ১৯৭২ পরবর্তীকালে ভুট্টো যখন নিজেকে আরো সংহত করল ও ভূ-স্বামী গ্রুপগুলির প্রতি ঝুঁকল, তখন সহজেই এদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা গেল। তবে সরকার গঠন করার পর পিপিপি-র শ্রেণী বিন্যাসের এই পরিবর্তন কোনো আপতিক ঘটনা কিম্বা ভুট্টোর ব্যক্তিগত বিশ্বাসঘাতকতাও ছিল না যেরকমটি পিপিপি-র বহিষ্কৃত ক্যাডাররা অনেকেই মনে করে থাকেন। পিপিপি-র আভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিন্যাসের এই পরিবর্তনটা ঘটেছে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে এর পরিবর্তিত অবস্থানের বিষয়গত (objective) কারণে। নির্বাচনের পূর্বে একটা গণভিত্তি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, পাওয়ার জন্যে নির্বাচনের পূর্বে পিপিপি-কে র‍্যাডিকাল পেটি বুর্জোয়াদেরকে সঙ্গে নিতে হয়েছে। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মতসমূহ প্রচার করে নানা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একবার সরকার গঠন করার পর, ইতিমধ্যে তৈরী একটা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে চলতে গিয়ে পিপিপি-কে প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা অস্ত্রে পরিণত হতে হয়। হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে মেনে নেওয়া কিম্বা বিলুপ্ত হওয়া এই দুইটি ছাড়া এর বামপন্থী কর্মীদের সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকে না। ঘটনাক্রমে, বামপন্থীরা অবশ্য বিলুপ্তই হলো। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনগুলো ঠিক কী কী ছিল? এখানে আমরা, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পরই পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রে সৃষ্ট নানা বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

এমন একটি দেশে, যেখানে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দেশের প্রায় মোট উৎপাদনের পরিমাণের অর্ধেক, যে দেশটি তার বাজেট ও বিশাল পরগাছা এক সেনাবাহিনী পোষার খরচের ব্যাপারে পুরোপুরিই সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল, পিপিপি সেদেশে, কি বৈদেশিক ক্ষেত্রে, কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের কাঠামোর বাইরে কিছু করতে পারেনি। এ কাজ একটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সাধন ছাড়া অসম্ভব যা ভুট্টো যে পেশা ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানে জাতীয় বুর্জোয়ারা খুবই অবিকশিত এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোটা সামরিক-আমলাতান্ত্রিক ; তৃতীয়তঃ যদিও পাকিস্তানে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান ও শক্তিশালী, তবুও "আঞ্চলিক" ভাবে আধা-সামন্ত ভূ-স্বামীরা কর্তৃত্ব করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক-আমলাতান্ত্রিক কাঠামো দ্বারা

কোনঠাঁসা হয়ে পড়া পিপিপি এইসব আধা-সামন্ত ভূ-স্বামীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হলো। যারা বামপন্থীরা দলত্যাগ করলে সেই জায়গাগুলো পূরণ করেছে।[৫] চতুর্থতঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বহুজাতিক একটা দেশে কর্তৃত্বশালী শ্রেণীগুলির পক্ষে কাজ করতে করতে সেনাবাহিনী নিজেই একটা কর্তৃত্বশালী সামাজিক উপাদানে পরিণত হয়েছিল। আর শেষতঃ, ১৯৭০ দশকের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, যে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, পেটি বুর্জোয়ারা যে ধরনের র‍্যাডিক্যাল সংস্কার চাইছিল তা' অসম্ভব করে তোলে। এইসব কারণের ফলে এই শ্রেণীটি একটা রাজনৈতিক বোঝায় পরিণত হয় এবং তাদের হটিয়ে দেয়া হয়।

ভুট্টো ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর যে পরিস্থিতিতে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতায় এল, সেই পরিস্থিতিটার মূল বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যাক।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের আকার অর্ধেক হলো। দেশটা অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি হলো। এর বুর্জোয়ারা গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ল এবং সামরিক (একটা যুদ্ধ-বাহিনী হিসেবে) ও রাজনৈতিক (১৯৫৮ সাল থেকেই রাষ্ট্র-ক্ষমতায় থেকে আসা দেশের সবচে' শক্তিশালী রাজনৈতিক যন্ত্র) এই উভয়দিক থেকেই সেনাবাহিনীর পতন ঘটল। দ্বিতীয়তঃ মতাদর্শগত সঙ্কটটাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর আগে পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল ভারতীয় মুসলমানদের "জাতীয় আবাসভূমি"। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা যাচ্ছে না কারণ বাংলাদেশে, এমনকি ভারতেও এখন পাকিস্তানের চেয়ে বেশী মুসলমান বাস করছে। দেশটি তার অস্তিত্বের কারণটাই হারিয়ে ফেলল। তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছাড়াও ১৯৬৮ সাল থেকে শহরে ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ খুবই জঙ্গীপনা দেখিয়েছে। ভুট্টো ক্ষমতায় আসার পর থেকে কারখানা দখল বা গ্রামাঞ্চলে জমি দখলের যেসব ঘটনা ঘটেছে তা' ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-আন্দোলনেরই জের। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন দাউদ কটন মিল বা কোহিনূর রেয়ন মিল দখল করার সময় শ্রমিকেরা এই মোহে ভুগেছিল যে "তাদের" ভুট্টো সরকার একচেটিয়া ও মুৎসুদ্দী শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে সাহায্য না করুক, অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকবে। চতুর্থতঃ পিপিপি সরকার ছিল পাকি-

স্তানের প্রথম নির্বাচিত সরকার। অবশ্য দলটির কোন যৌথ নেতৃত্ব ছিল না এবং তা' শুরু থেকেই ভুট্টোর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। এর ফলে দল ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুট্টো কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা নিতে পারত।

সেনাবাহিনীর পতন, বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিকভাবে ভেঙ্গে পড়া, রাষ্ট্রের মূল আদর্শের চরম সঙ্কট, একটা গণ-আন্দোলনের অস্তিত্ব এবং স্ব-ঘোষিত "সমাজতন্ত্রী" এক ব্যক্তির হাতে অসীম ক্ষমতা পাকিস্তানে একটা আদর্শ বিপ্লবী পরিবেশ (বিপ্লবী "সঙ্কট" নয়, কারণ রাষ্ট্র-ক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মত প্রলেতারীয় পার্টি তখন পাকিস্তানে নেই, তবে বিষয়গত অবস্থা বৈপ্লবিক ছিল) ছিল। অন্য কথায়, ভুট্টোর "সমাজতন্ত্র"-র পরীক্ষার উপযুক্ত এক সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল।

ভুট্টো এসময় মূলতঃ তিনটি জিনিষ করলেন। প্রথমতঃ তিনি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক বড় রকম আপোষ করলেন যা আই এম এফ-এর সঙ্গে তার লেন-দেনে মূর্ত হতে দেখি। এর মধ্যে রয়েছে মুদ্রার মূল্য শতকরা ১৩০ ভাগ হ্রাস, প্রায় ৩০০ পণ্যের উপর থেকে আমদানী শুল্ক তুলে নেয়া, বিদেশী পুঁজিকে জাতীয়করণ থেকে অব্যাহতি দেয়া। নির্মমভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে দমন (১৯৭২ সালের জুন ও অক্টোবর মাসে ধর্মঘটী শ্রমিকদের দমনে আধা-সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার) ও বিদেশী মূলধনী পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটানো, যে কারণে পরবর্তী চার বছরে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের বোঝা দ্বিগুণ হলো। দ্বিতীয়তঃ ভুট্টো এই সুযোগটাতে তার নিজস্ব দলীয় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করল। তৃতীয়তঃ কিছু কিছু সংস্কার, এমনকি অর্থনীতির কিছু কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনও করা হলো। অবশ্য তা' সবই করা হলো প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের মডেল অনুযায়ী, যে মডেল ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তান অনুসরণ করে আসছে।

রাষ্ট্রের সঙ্কট দূর ও নিজের শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ভুট্টো কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিলেন। সেনাবাহিনীতে তিনি দুই দফা বহিষ্কার করলেন। প্রথমবারে বাংলাদেশ সঙ্কটের সময় ক্ষমতায় শীর্ষবিন্দুতে যারা ছিল সেই পাঁচজন জেনারেলকে যথার্থভাবেই "মোটা ও অথর্ব" আখ্যা দিয়ে বিদায় করলেন। দ্বিতীয় দফায় যারা তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে এমন দু'জন সেনানায়ক, জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার কমোডোর রহিমকে বিদায় করলেন। এইভাবে ভুট্টো তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে

নিজের ইচ্ছামত চলার জন্য অনেকখানি জায়গা করে নিলেন। এটা উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশ ও বেলুচিস্তানের "কসাই" নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খান টিকে গেলেন এবং প্রথমে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং অবসর গ্রহণের পর ভুট্টোর সামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা হলেন। সবার শেষে ভুট্টো চারজন সিনিয়র জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে জিয়াউল হককে সেনাবাহিনীর প্রধান করলেন যে জিয়াউল হকের অতি-দক্ষিণপন্থী সংযোগের কথা আগেই পরিচিত ছিল। এই শেষের ঘটনাটি ভুট্টোর দিক থেকে নিঃসন্দেহে ছিল খুব বড় ভুল হিসাব, যার জন্যে তাকে উচচ খেসারত দিতে হয়েছে। এছাড়া ভুট্টোর "ফেডারেল নিরাপত্তা বাহিনী" নামে একটা আধাসামরিক বাহিনী সৃষ্টি করলেন যা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব-মুক্ত ছিল এবং মূলতঃ ছিল একটি রাজনৈতিক পুলিশ এবং তারা কাজকর্মের জন্যে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়ী ছিল। এটা লক্ষ্যণীয় যে ভুট্টোর বিরুদ্ধে মামলার প্রধান বাদীই হচ্ছে স্বয়ং ভুট্টো কর্তৃক নিয়োজিত এই "নিরাপত্তা বাহিনী"-র প্রধান মাসুদ মাহ্‌মুদ যাকে জুলাই-অভ্যুত্থানের স্রষ্টারা বিচার থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তাই ভুট্টোর ব্যক্তিগত করুণ পরিণতিটা হচ্ছে তার চরম দক্ষিণপন্থী সহকর্মী-দের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, যাদেরকে সে অনেক বাড়তি ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বাস করেছিল।

আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো জটিল। ভুট্টো দুর্নীতির দায়ে ১,৩০০ আমলাকে বরখাস্ত করে এবং সিভিল সুপিরিয়র সার্ভিস বা সি এস পি প্রথা তুলে দেয়। এছাড়া সরকারী খাত বৃদ্ধির ফলে এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ হাতছাড়া হয়ে যাবার ফলে (যেখানে এই আমলারা শাসন চালাত) অনেক আমলাই চাকুরী হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভুট্টোর মূল সমস্যা ছিল যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও বেলুচিস্তান ও সরহাদে তা ছিল না। বস্তুত একটা শক্তিশালী গণ-আন্দোলন বিরাজমান এই দুটি প্রদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)[৬] বেলুচিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং জে ইউ আই[৭] সরহাদে সবচে' বেশী সংখ্যক আসন পেয়েছিল। ১৯৭২ সালে সাংবিধানিক শাসন ফিরে এলে ন্যাপ-জে ইউ আই যুক্তফ্রন্ট এই দুই প্রদেশে সরকার গঠন করে। আড়াই বছরের ভেতরেই ভুট্টো এই দুই প্রাদেশিক সরকারকে বাতিল করে, ন্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ন্যাপ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে এই সমস্যার সমাধান করতে চায়।

নিপীড়ন ও অর্থ দ্বারা পিপিপি এই দুই প্রদেশেই কিছু মিত্র যোগাড় করতে পারলেও, বেলুচিস্তানে দু'বছরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের সভা করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার ফলে বেলুচিস্তানে যে প্রতিরোধ-লড়াই শুরু হয় সেটা সবাই জানেন। পরবর্তী তিন বছর ধরে বেলুচিস্তানে নিয়মিত প্রায় 100,000 সৈন্য পাঠানো হয়েছে এবং তাদেরকে পর্যায়ক্রমে পাল্টানো হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অধিকাংশই বেলুচিস্তানের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে যাতে প্রয়োজন পড়লেই দেশের অন্য কোনো জায়গায় সেই অভিজ্ঞতাকে তারা কাজে লাগাতে পারে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে গ্যারিসন-শহর ও নির্বিচার গুলী চালানোর এলাকা তৈরী করা, হেলিকপ্টারবাহী সৈন্য ও বিমানবাহী সরবরাহ প্রদান। এছাড়া গ্রামে ও আধা-যাযাবর সম্প্রদায়ের উপর নাপাম ও অন্যান্য বোমা ফেলার ব্যাপারটি তো রয়েছেই। এটা একটা নির্ভেজাল গেরিলাবিরোধী অপারেশন এবং এইভাবে সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের যে "সম্মান" হারিয়েছিল তা পুনরুদ্ধারে উঠে-পড়ে লাগে। এভাবে ভুট্টো বেলুচিস্তানের ক্ষেত্রে আবার সেনাবাহিনীর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভুট্টো তার সরকার গঠন করে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে ভুট্টো জাতীয়করণের, পাকিস্তানে এই প্রথম, কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং বেশ কিছু বড় শিল্পপতিকে হাতকড়া পরা অবস্থায় টেলিভিশনে দেখানো হয়। মার্চ মাসে ভুট্টো তার ভূমি-সংস্কার নীতি ঘোষণা করে যে কর্মসূচীকে রঙ চড়িয়ে "পাকিস্তানের কৃষকদের মুক্তিসনদ" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই ভূমি-সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তব স্বরূপ যতটা নয়, তার চেয়ে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বক্তৃতাবাজীর কারণেই সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এই গলাবাজীর ঝোঁক মে দিবসে চরমে পৌঁছল। দিনটিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হলো এবং ভুট্টো নিজেই "প্যারী কমিউনের আদর্শ" সম্পর্কে বক্তৃতা করা শুরু করল।

এর পরই এল উল্টো পরিবর্তন। জুন মাসে যখন আভ্যন্তরীণ শ্রমিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সাহায্যের প্রশ্নটা জড়িয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের এক প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফররত তখন সশস্ত্র পুলিশ করাচীর রাজপথে তিরিশজন শ্রমিককে গুলী করে হত্যা করল। অক্টোবরে পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক আরো চৌদ্দ জন শ্রমিককে হত্যা করা হলো এবং করাচীর বাইরেও প্রায় 8,000 শ্রমিককে গ্রেফতার কিম্বা আত্মগোপনে

যেতে বাধ্য করা হলো। গত কয়েক বছরে দেশীয় শিল্পের মন্দার কারণে হাজারে হাজার সংখ্যায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়। এছাড়া সশস্ত্র পুলিশ কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন অফিসসমূহ পুরোপুরি ধ্বংস, কারখানা দখল (এমনকি গোটা শিল্প এলাকা) ও ব্যাপক গ্রেপ্তার-নির্যাতন ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে জঙ্গী শ্রমিক নেতাদের হত্যাও করা হয়। অবশ্য শ্রমিকরাও পাল্টা জবাব দেয়ার চেষ্টা করে। ১৯৭২ সালে শ্রমিকদের কর্তৃক "সেভেন-আপ" ও কোহিনূর শিল্প দখল ; ও একই বছর করাচীতে "সাইট" ও লাণ্ডি-কোরাঙ্গী শিল্প-এলাকায় ৮০,০০ শ্রমিকের দীর্ঘস্থায়ী হরতাল ; ১৯৭৪-৭৫ সালে রেলওয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন ; ১৯৭৪-৭৫ সালে গোটা সোয়াতে ৬০ দিনের ধর্মঘট ; ১৯৭৫ সালের গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে হায়দ্রাবাদে জঙ্গী শ্রমিকদের আন্দোলন ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রমিকশ্রেণীর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে সরহাদের কৃষকদের মাঝে আমরা কিছু জঙ্গী আন্দোলন লক্ষ্য করি এবং নিপীড়িত জাতিসত্তা-সমূহের আন্দোলন, বিশেষ করে বালুচদের আন্দোলনের মাঝে বিভিন্ন রকম মার্কসবাদী ধারার লক্ষণও দেখা যেতে থাকে। এসব সংগ্রামের ইতিহাস অন্যত্র বলা যাবে। এখানে বলার কথা এটাই যে পিপল্‌স পার্টির হাতে বহু শ্রমজীবী মানুষই শহীদ হয়েছেন এবং দুঃখজনক যে এ তালিকাটা বেশ দীর্ঘ।

সংস্কারবাদী মডেলের রাজনীতি

এইসব নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে ভুট্টোকে একজন "ফ্যাসিস্ট" হিসেবে আখ্যায়িত করার ঝোঁক কোন কোন কমরেডের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে এসব কমরেড সামরিক সরকারের সঙ্গেও সহযোগিতার দিকে এগিয়ে যান এবং ভুট্টো সরকারের সংস্কারবাদী দিকগুলো ভুলে যান, ভুলে যান যে দ্বন্দ্ব বর্তমানে সামরিক সরকার ও পিপির-র মাঝে রয়েছে এবং পিপিপি সরকারের আমলে জনগণ যেটুকু অধিকার অর্জন করেছিল বর্তমান সরকার তা' নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এই অর্জনগুলি কি কি তা' সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা যাক।

মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভুট্টোর সোশ্যাল-ডেমেক্র্যাটিক ধ্যান-ধারণার অবদানটা আমাদেরকে পাকিস্তানের সমাজ-চিত্রের আলোকে বুঝতে হবে। ধর্মীয় উন্মাদনা দ্বারা সৃষ্ট আধা-সামন্তবাদী কাঠামোর এক দেশে যেখানে এক

প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক বাহিনী বিগত তের বছর ধরে শাসন চালিয়ে এসেছে এবং যেখানে দুই যুগ ধরে ডালাসীয় ধরনের কমিউনিজম-বিরোধিতা প্রচার করে আসা হয়েছে এবং যে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল কোনো সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে ওঠেনি, এমন এক দেশে "সমাজতন্ত্র" শব্দটির প্রচারই একটা ইতিবাচক দিক এবং এটা ভুট্টোর অবদান। যে সমাজতন্ত্র শব্দটি পাকিস্তানের আধা-সামন্তবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছিল একটি প্রায়-নিষিদ্ধ শব্দ, ভুট্টো তাকে মানুষের একটা দৈনন্দিন আলাপের বিষয়ে পরিণত করেছেন এবং তা' জনগণের কাছে সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা বৈধ প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছে। যেরকম আইয়ুবের পুঁজিবাদী পথের প্রতিক্রিয়ায় পিপিপি-র সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর জন্ম দিয়েছে, তেমনই পিপিপি-র সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে মার্কসবাদের ব্যাপক প্রসার। যেহেতু পিপিপি সরকারের ভিত্তি ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-আন্দোলন সেইহেতু তা' দেশে ব্যাপকহারে বিপ্লবী সাহিত্য প্রকাশ, আমদানী ও প্রচারের অনুমতি দেয় যে বিষয়টা আগে পাকিস্তানে অচিন্ত্যনীয় ছিল।

অর্থনীতির ব্যাপারে ভুট্টোর আমলে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে, যে বিষয়টি আমরা পরে দেখাব, কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভুট্টো ব্যাপক-প্রচারিত কিছু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নেয় যা জনগণের চেতনাতে প্রভাব ফেলেছে। যেমন ভুট্টো দ্রুত উত্তর কোরিয়া ও পূর্ব জার্মানী এবং কিছুদিন পর ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার বিপ্লবী সরকার সমূহকে স্বীকৃতি দেয় এবং চীন, রুমানিয়া, উত্তর কোরিয়া ও পিএলও-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ করা হয় এবং মোজাম্বিক, জিম্বাবুই, পূর্ব তিমুর ও স্পেনীয় সাহারা সহ বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনসমূহকে সমর্থন দেয়ার জন্য পাকিস্তানের কূটনীতিকদের নির্দেশ দেয়া হয়। ভুট্টো চিলিতে ফ্যাসিস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে সাম্রাজ্যবাদকে দোষারোপ করে এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উদ্যোগ নেয়। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশই এরকম অবস্থান নিয়ে থাকলেও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন ছিল। ভুট্টোর আগে ও পরে সব সামরিক সরকারই যখন পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদের "সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র"-এ পরিণত করতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে যেখানে ভুট্টো সরকারের এসব পদক্ষেপ জনগণের

চেতনায় কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল কারণ দেশটির ইতিহাসে এবারই প্রথম সরকারী প্রচার-মাধ্যমে প্রগতিশীল বাক্যাংশ ব্যবহার ও সমাজতান্ত্রিক দেশ ও মুক্তি আন্দোলনসমূহকে জনগণের শত্রু নয়, বরং মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে তুলে ধরা হলো।

ভুট্টোর আমলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি নির্যাতন ও যেসব ইউনিয়নে মার্কসবাদীদের প্রাধান্য রয়েছে সেসব ইউনিয়নের বিরুদ্ধে স্থানীয় পিপল্‌স পার্টি, মিল-মালিক ও দক্ষিণপন্থী পার্টিসমূহের সঙ্গে যোগসাজস করলেও এটাও সত্য যে, পিপিপি শাসনের প্রথম তিন বছরে যত শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকৃত করা হয় বিগত দুই দশকে তা' করা হয়নি। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই মধ্যস্তরের পিপিপি নেতারা জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন দিয়েছে। আর সাবিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে, শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেলেও পরিবর্তিত বেতন হার, চাকুরীর নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে সরকারী খাতের শ্রমিকশ্রেণী বেশ ভালো পরিমাণে অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং তা ব্যক্তি-খাতে কর্মরত শ্রমিকদেরও প্রভাবিত করে। এইসব অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কারণে সরকারী খাতের শিল্প-শ্রমিকেরা প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জাতীয়করণের প্রসঙ্গটি আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে বলতে চাই যে পাকিস্তানে ভুট্টোর এই জাতীয়করণ নীতির সামাজিক তাৎপর্য্য তার তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক তাৎপর্য্যের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। অতীতে পাকিস্তানে সরকারী খরচে কারখানা বানিয়ে ব্যক্তি-মালিকানায় তুলে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তি কখনোই জাতীয়করণ করা হয়নি। তাই যতই আমলা-নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত আকারে এটা করা হয়েছিল তবুও উৎপাদনের উপকরণের এই সামাজিকীকরণের ব্যাপারটি বুর্জোয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আশার সঞ্চার করে। তেমনি আরো কিছু কিছু সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পদক্ষেপ, যেমন সামাজিক নিশ্চয়তা ব্যবস্থার প্রসার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ, কিছু সংখ্যক ভূমিহীনের মধ্যে জমি বন্টন ইত্যাদি ঘটনারও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্যের চেয়ে বেশী সামাজিক একটা তাৎপর্য্য রয়েছে। এ জাতীয় একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৯৭৭ সালের জানুয়ারীতে ঘোষিত ভূমি-সংস্কারের ঘোষণা, যে ঘোষণা ভুট্টো দিয়েছিলেন কিন্তু জুলাইয়ের সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। এই পদক্ষেপটা কিছুটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

এই ভূমি-সংস্কারকে পাকিস্তানের ভূমি-মালিকানা ও ভূমি-কর কাঠামোর আলোকে বিচার করতে হবে। সংক্ষেপে পরিসংখ্যানগুলো নিম্নরূপ ; ১৯৫৯ সালের প্রথম ভূমি-সংস্কারের পূর্বে (আইয়ুব খানের সামরিক সরকার কর্তৃক ঘোষিত) দেশের মোট আবাদী জমির ৫১·৪%-এর মালিক ছিল ৬·৮% এবং সবার উপরে ১·২% ভূ-স্বামী ছিল ৩০·৪% জমির মালিক।[৯] তাছাড়া, বড় ছোট সবরকম জমির মালিকের জমির খাজনা একইরকম ছিল। ১৯৫৯ সালের ভূমি-সংস্কারে মোট ৪৮·৬ মিলিয়ন একরের মধ্যে সরকার মাত্র ২ মিলিয়ন একর দখল করে। ভূ-স্বামীরা তাদের জমির মাত্র ৪% হারায় আর সরকারকে তারা যেসব জমি প্রদান করে তার অর্ধেকই ছিল পতিত জমি। পাহাড় কিম্বা নদীর চড়া, ফলে চাষের অযোগ্য। এই বাড়তি জমি পুর্নবন্টনের ফলে ৩%-এরও কম কৃষক লাভবান হয়। ১৯৭২ সালের ভূমি-সংস্কারে, যা ছিল ভুট্টোর প্রথম ভূমি-সংস্কার, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ পরিমাণ ৮০,০০০ পি আই ইউ (প্রডাকশন ইনডেক্স ইউনিটস) থেকে কমিয়ে ৩২,০০০ পি আই ইউ-তে আনা হয়। এই ব্যবস্থায় ১৯৭৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ ৬৭,২৪০ কৃষক পরিবার ৬৬০,০০০ একর চাষযোগ্য জমি পায়, পরিবার পিছু প্রায় ১০ একর করে।[১০] তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ১৯৫৯ ও ১৯৭২ এই দুই ভূমি-সংস্কারেই জমির খাজনার বিষয়টি আগের মতই রেখে দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে খাজনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম সংস্কারটা করা হয়। ১২ একরের কম জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করা হয় এবং জমির মালিকানার পরিমাণ বেশী হওয়ার সঙ্গে জমির খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়। এই পদক্ষেপগুলি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হতো তাহলে ৭১% জমির মালিক সরকারী খাজনা থেকে রেহাই পেত, ২২%-কে আগের হারেই খাজনা দিতে হতো এবং সবচেয়ে ধনী ৭%-কে খাজনা বাবদ বাড়তি ১৫৩ মিলিয়ন রুপী দিতে হতো।[১১]

১৯৭৭ সালের ভূমি-সংস্কারের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। প্রথমতঃ জমির সিলিং জলসেচকৃত জমির জন্য ১০০ একর ও জলসেচকৃত নয় এমন জমির জন্যে ২০০ একর করা হয়। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের আধা-সামন্তবাদী কাঠামোটা ভেঙ্গে পড়ত। এই ভূমি-সংস্কারের ঘোষণার ফলেই কৃষকদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে ও গ্রামাঞ্চলে ভুট্টোর নির্বাচনী ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করে। দ্বিতীয়তঃ ২৫ একরের কম জমির মালিকদের খাজনা সম্পূর্ণরূপে মওকুফ করে দেয়া হয়। এই পদক্ষেপ প্রায় ৯১% কৃষকের

উপকারে আসে যে সংখ্যাটি পাকিস্তানের তৎকালীন অর্ধেকের চেয়ে বেশী আবাদী জমির মালিক ছিল। তৃতীয়তঃ এই প্রথমবারের মত ২৫ একরের বেশী জমির মালিকদের উপর কৃষি আয়কর প্রবর্তন করা হলো। কৃষিতে ধনবাদের বিকাশ এবং তথাকথিত "সবুজ বিপ্লব"-এর ফলে ভূ-স্বামীদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কর বসানো প্রয়োজনীয় ছিল। আধা-সামন্তবাদী ভূ-স্বামীরা এই কৃষি-আয়করকে তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি একটা বড় আঘাত বলে মনে করেছিল।

মার্চ নির্বাচনের ঠিক তিন মাস আগে এসব সংস্কারের ঘোষণা পিপিপি-র নিজস্ব সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষিতে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান বিকাশকে আরো শক্তিশালী করা, ক্ষুদে উৎপাদক শ্রেণীটাকে সহায়তা প্রদান করা এবং আধা-সামন্তবাদী শ্রেণীটার কাছ থেকে রাষ্ট্রের জন্যে আরো কর আদায় করে নেয়া। জমির সিলিং কমিয়ে ভুট্টো ভুমিহীন, গরীব ও মাঝারি কৃষকদেরকে আসন্ন নির্বাচনে তার পক্ষে টেনে আনতে পারল। অন্যদিকে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পসমূহ জাতীয়-করণ করে এই সরকার যে গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণীটাকে বিরূপ করে তুলেছিল তারা এই সুযোগে চরম রক্ষণশীল বড় বড় ভূ-স্বামীদের সঙ্গে হাত মেলান। এছাড়া পাকিস্তানের তৎকালীন অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে মধ্যস্তরের জীবন-যাত্রার মানের ক্রমনিম্নগতি এবং এই শ্রেণীর মধ্যে অতি দক্ষিণপন্থী ভাব-ধারার অনুপ্রবেশ ভুট্টো-বিরোধী একটা মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এটা ঠিক যে নির্বাচনে ভুট্টোর দল কিছু কারচুপি করেছিল, কিন্তু পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম এর পরিমাণ যতটা বলেছে, ততটা নয়। ভুট্টোর পক্ষে প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ কম বেশী হতে পারত, কিন্তু ভোট নিরপেক্ষভাবে হলেও ভুট্টোই জিতত। তাই নির্বাচনের দুদিন পরেই সরকারকে অস্থিতিশীল করে দেয়ার জন্যে যে আন্দোলনটা শুরু করা হলো, তার নেপথ্য শক্তি, সময়টা বেছে নেওয়া ইত্যাদি থেকে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে যে এ ব্যাপারটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল এবং এর পেছনে সেনাবাহিনীর হাত ছিল। এই আন্দোলনে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা অর্থ প্রদান করে এবং পেটি বুর্জোয়ার একাংশ ও বড় ও মাঝারি শহরগুলির লুম্পেন প্রলেতারিয়েতেরা এতে অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের ব্যাপারে ব্যক্তি ভুট্টো, "সমাজতন্ত্রী" ভুট্টো, সবার টার্গেটে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানে চরম-দক্ষিণপন্থা একটা গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

'৭০ দশকের অর্থ নৈতিক সঙ্কট

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য বাজার, অর্থ সরবরাহ এবং উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। আগে পাট ও চা প্রধান রপ্তানী পণ্য ছিল। এখন বিকল্প রপ্তানী দ্রব্য প্রয়োজন পড়ল। আগে "পূর্ব-পাকিস্তান" (বর্তমানে বাংলাদেশ) পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্যের ৪০% ক্রয় করত। এখন বিকল্প বাজার খোঁজার দরকার পড়ল।

বিশেষজ্ঞদের মতে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের বিদ্রোহ প্রশমনে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে ও পরে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনে ২ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। এছাড়া এক বছরব্যাপী উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তানীদের শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করে ফেলে। এর ফলে শুধু যে বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারাই নয়, আদমজী, দাউদ, ইস্পাহানী প্রভৃতি একচেটিয়া পরিবার-গুলিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তাদের বিনিয়োগ মূলতঃ পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল।

এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে অর্থনীতির সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রয়োজন ছিল এবং এই সরকারের শ্রেণী অবস্থানের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। বরং ভুট্টো সরকার এ ব্যাপারে এমন কিছু পদক্ষেপ নিল যা সঙ্কট আরো বৃদ্ধি করল।

প্রথম মুদ্রার ১৩০% মূল্যহ্রাস করা হলো এবং আই এম এফ-এর শক্ত চাপে পড়ে ৩০০-এরও বেশী পণ্যের উপর থেকে আমদানী নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হলো। কোনো বিদেশী পুঁজি জাতীয়করণ করা হলো না এবং ১৯৭৬ সালে জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানে এই প্রথমবারের মত বিদেশী পুঁজিকে জাতীয়করণের আওতায় আনা হবে না এই মর্মে এক আইন পাশ করল। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হচ্ছে "ক্ষতিগ্রস্ত" দেশী পুঁজিপতিদের ব্যাপক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো। যেমন পাকিস্তানের ব্যাঙ্কিং-এর প্রধান এক-চেটিয়া পরিবার হাবিব ব্যাঙ্ককে তার প্রতি শেয়ার বাবদ ৩৬·৩১ রূপী দেয়া হলো যার আসল মূল্য ধরা হয়েছিল ৫ রূপী। নির্মাণক্ষেত্রে এসব তথাকথিত জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য হচ্ছিল অর্থনৈতিক অলাভজনক শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তি মালিকদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া। ১৯৭৫-৭৬ সালের পাকিস্তান সর-

কারের অর্থ বিভাগের "পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে" কথাটা এই ভাবে উপস্থিত করে যে,

"....অদক্ষ প্রশাসনের ফলে এইসব অনেক কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং তাদের মূলধনের চেয়ে তাদের লোকসানের পরিমাণ বেশী। এদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে "অর্থনৈতিক সংস্কার ঘোষণা করা হয়"।[১২]

এর চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ব্যাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলো জাতীয়করণ (১৯৭৪) করার প্রসঙ্গটি। (বিদেশী ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীগুলি, যারা পাকিস্তানের মোট ঋণের ১২% নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, অবশ্য সবচে' উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলিতে, সেগুলি ছাড়া অনান্য বীমা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়)। এই পদক্ষেপের ফলে বিনিয়োগ, ঋণ-প্রদান ও মুদ্রা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অর্জন করে এবং একইভাবে তা' রাজনৈতিক মিত্রদের পুরস্কৃত এবং পাকিস্তানের পুঁজিবাদের অবস্থানকে শিল্পখাত থেকে কৃষিখাতে স্থানান্তরিত করার (যে বিষয়টি আমরা এখন তুলে ধরব) পক্ষে সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটায়। ১৯৭১ সালে শিল্প ঋণের ৮৪% ব্যাঙ্ক-ঋণ থেকে আসত। কিন্তু বর্তমানে সরকার ইচ্ছা করলে সকল ঋণ অন্য খাতে বিতরণ করতে এবং পুঁজির অভাবে শিল্পখাতকে শুকিয়ে মারতে পারত। এছাড়া এর ফলে রাষ্ট্র তার নিজের আর্থিক ঘাটতি ব্যাঙ্কের অর্থ দিয়ে পুরণ করার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশী সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ফলে দেখা যায় যে ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭ সালে ব্যাংক থেকে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ মিলিয়ন রূপী এবং মুদ্রার সরবরাহ ১৯৭১-৭২ সালের ২৩,০০০ মিলিয়ন রূপী থেকে বেড়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে ৫৭·০০০ মিলিয়ন রূপীতে পরিণত হয়। শুধুমাত্র ১৯৭৫-৭৬ সালেই এসব বাণিজ্যিক (জাতীয়করণকৃত) ব্যাংকের কাছে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৭ মিলিয়ন ডলার এবং ওই এক বছর অর্থ-সরবরাহ বাড়ে ২০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২০%। এই ঋণ-গ্রস্থতার ফলে পাকিস্তানী মুদ্রা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মাত্র ১৫% পাকি-স্তানী মুদ্রার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ও সোনা রির্জাভ ছিল।

এসব বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং বৃদ্ধি পায় এবং এতে গ্রামের সম্পত্তিবান শ্রেণীটি লাভবান হয়। ফলে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ব্যাংকের

শাখার সংখ্যা ৫৪%, আমানতের পরিমাণ ৮০%, ঋণপ্রদান ৬৫% এবং ব্যাংক কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫% বৃদ্ধি পায়। ১৭৪৪টির মধ্যে ১০৮০টি ব্যাংক-শাখাই অবস্থিত ছিল গ্রামাঞ্চলে। শুধুমাত্র ১৯৭৫-৭৬ সালেই ১৬৫ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ ছোট ও মাঝারি আকারের ঋণ ভূ-স্বামী কুলাক ও আধা-মফস্বল শহরের ছোট বুর্জোয়ারা পায়। কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামাঞ্চলে ঋণের দ্রুত প্রসারের ব্যাপারটি নীচের সারণিটি থেকে বোঝা যাবে।

সারণি ৪.১

কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (১০ লক্ষ রূপী হিসেবে)

বিষয়	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬*
ট্রাক্টর	৩৭০.৪১	৪৩০.৬৫	১৮০০.৩০	১৩৯০.৫৪	২২০০.৪০
টিউবয়েল	১৮০.৪১	২৬০.৪২	৫১০.৩৩	৮৬০.৬৭	×
অন্যান্য কৃষি উপকরণ	১৩০.৫৩	৪৭০.২৫	১২৩০.৪৬	৯৩০.৩৮	×

*প্রথম নয় মাস

ওই একই সময়কালে ট্রাক্টর ও টিউবওয়েলের ব্যাপারে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণ চারগুণ এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রে তা' ৬০০% বৃদ্ধি পেল। রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকী ১৯৭১ সালের ২.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৬০ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেল। যদিও ব্যাঙ্কের খাতায় যেভাবে লেখা আছে এই সব অর্থই সেই কাজে ব্যবহৃত হয়নি, তবুও ঋণের এই প্রসার গ্রামাঞ্চলে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারটি তুলে ধরে। এছাড়া কৃষি উপকরণ ব্যবহার, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭-৭৭ এই দশকটাতে ধান, গম ও ভুট্টা এই তিনটি প্রধান শস্যের একর প্রতি ফলন ৫০% বৃদ্ধি পেল। একই ভাবে, পূর্ব পাকিস্তানসহ গোটা পাকিস্তানেই যখন ১৯৬৮ সালে ১৬,৫০০ ট্রাক্টর ছিল, সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তান একাই ৭,০০০ ট্রাক্টর আমদানী করে, ১৯৭৫-৭৬ সালে করে ১৫,০০০ এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে ১৭,০০০। তবে এসব পরিসংখ্যান থেকে ভুল সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না। কারণ শ্রেণী কাঠামোগত কারণে

(সম্পত্তি ও মালিকানার পদ্ধতি) "উন্নয়ন"-এর গোটা অর্থটাই ভিন্ন হয় এবং আমরা পরে দেখব যে তা' আরো সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে।

তবে এই নতুন আয়সমূহ শুধুমাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ সামাজিক স্তরেই নয়, কয়েকটি বিশেষ এলাকাতেও সীমিত যেসব এলাকা কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের উপযোগী, মূলতঃ মধ্য পাঞ্জাব, সিন্ধুর জলসেচের আওতায় আনা নতুন কৃষিজমি (যার অধিকাংশের মালিক অ-সিন্ধীরা) এবং সরহাদের সেই সব জেলা যেখানে জল-সরবরাহ পর্যাপ্ত ও যেসব জমি কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলের কিছু শ্রেণীর এই সমৃদ্ধি অন্যান্য অঞ্চলগুলোর, যা পাকিস্তানের প্রধান এলাকা, মানুষের জীবনে ব্যাপক দুর্ভোগ বয়ে এনেছে। তাদের আয় বাড়েনি, কিন্তু তারা একই বাজারের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য বেড়েছে। তাই এই একপেশে উন্নয়ন বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলের মধ্যে সংঘাতেরই জন্ম দিয়েছে।

কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীন বেকারত্ব বেড়েছে। পাশাপাশি তেল-ধনী উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রায় ক্রীতদাস-সুলভ শ্রমের বাজার সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তান থেকে দলে দলে শ্রমিক, কারিগর ও নিঃস্ব কৃষকেরা মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমাতে থাকে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭-এর মাঝামাঝি থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৮,০০০ এরকম মজুর-শ্রমিক পাকিস্তান থেকে যাচ্ছে। ফলে শ্রমই হয়ে পড়েছে পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানী পণ্য। ১৯৭৬-৭৭ সালে অন্য সকল রপ্তানীকৃত পণ্য থেকে যেখানে আয় হয়েছে ১,১২৯ মিলিয়ন ডলার সেখানে শুধুমাত্র এই খাতেই আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭৫ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই ক্ষেত্রে কৃত বৈদেশিক মুদ্রার আয় দ্বিগুণ বেড়ে হয় ১,১৪৯ মিলিয়ন ডলার।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। আমদানীকৃত তেলের উপর পাকিস্তান নির্ভরশীল থাকলেও ১৯৭৪-৭৫ সালে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাকিস্তানে আমদানীর পরিমাণ পাকিস্তানের মোট আমদানীর ২০%-এরও কম। অন্যদিকে পাকিস্তানের অন্য ছয়টি মূল রপ্তানীর দেশ যথা ক্রমানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কাছে মোট রপ্তানীর চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যেই পাকিস্তানের রপ্তানীর পরিমাণ বেশী ছিল। বস্তুতঃ মধ্যপ্রাচ্যই ছিল পাকিস্তানের একমাত্র ব্যবসায়-সহযোগী যার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল। আর চারটি প্রধান পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় চার-

এক হারে যা দুই দশক ধরে চলে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই ঘাটতি ছিল সর্বোচ্চ। রপ্তানীর পরিমাণ ছিল আমদানীর ১২% মাত্র। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্যের মাত্র ৫% অনুষ্ঠিত হতো। এর মধ্যে সোভিয়েত কর্তৃক সাহায্যের পরিমাণ চীনের চেয়ে বেশী ছিল।

আমদানীর ক্ষেত্রেও আমরা অধঃপতন লক্ষ্য করি। ১৯৭০-৭১ সালে ভোগ্যপণ্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৮৩.৭ মিলিয়ন ডলার ও যন্ত্রপাতি পরিবহন ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক খাতে এর পরিমাণ ছিল ৩৭৮.১ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় সমান সমান। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রথমটির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১,২৮৪.৩ মিলিয়ন ডলারে এবং দ্বিতীয়টি কমে আসে ৩৫৬ মিলিয়নে। এইভাবে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ভোগ্যপণ্য বাবদ ব্যয় প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। যে দেশটির কোনো ইস্পাত কারখানা নেই এবং যে দেশটি তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ১৫%-ও উৎপাদন করতে পারে না, এমন দেশের জন্যে নিঃসন্দেহে এটি একটা উল্লেখ করার মতই বিষয়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বন্ধ্যাত্বের পাশাপাশি বেড়ে চলে সামরিক খাতে ব্যয়। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত গড়ে মোট রাজস্ব আয়ের ৪৪.৪% সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে। যে সময়টার বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেই ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সাল এই চার বছরে সামরিক বাহিনী ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (আধা-সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ও পুলিশ) বিষয়ক ব্যয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে বর্তমানে বাজেটের ৫৫% সামরিক বাহিনীর খাতে যাচ্ছে এবং এর পরিমাণ হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে যে ১৭০.৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে তার চারগুণ।

পরগাছা ও অনুৎপাদনশীল খাতে এত পরিমাণ ব্যয় করার কারণে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাবিষয়ে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৭-এর মার্চের মধ্যে সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ২০৩ মিলিয়ন ডলার বা ৩৫% কমে গেছে। সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার ভিত্তিতে দেশের ভেতরে মুদ্রার সরবরাহ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ৭·২১ বিলিয়ন রূপী থেকে ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে ১৬·২৩ বিলিয়ন রূপী হলো এবং সোনা বা বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ও মুদ্রা সরবরাহের আনুপাতিক হার ১৯৭১-৭২ সালে ২৩·৬ ১০০ থেকে কমে ১৯৭৭ সালে ১৩·১০০ হলো। মুদ্রার এই বাড়তি সরবরাহ কিন্তু শিল্প-খাতে গেল না। বরং আমরা দেখি যে শিল্প খাতে বিনি-

য়োগের পরিমাণ ক্রমশঃই কমছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ যেখানে ছিল ১৩৫·৯ মিলিয়ন ডলার, ১৯৭০-৭১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯৯·৫ মিলিয়ন ডলারে, ১৯৭১-৭২ সালে ৮৩·৭ মিলিয়ন ডলারে এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ৭০·৮ মিলিয়ন ডলারে। এই ক্রমাবনতির কারণে আই এম এফ-এর পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ আমদানী-নীতি ও পাকিস্তানী পণ্যের অপ্রতি-যোগিতামূলক চরিত্রই দায়ী।[১৩]

পাকিস্তানের-উৎপাদন ব্যবস্থার এই সঙ্কট, কৃষিতে ধনবাদের সমস্যা, রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক সংস্থাসমূহের পরগাছা অবস্থান, শিল্পে বন্ধ্যাত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও হস্তক্ষেপ, জনগণের, যাদের আপেক্ষিক দারিদ্র্য ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, জীবনযাত্রার আয়ও বৃদ্ধি করেছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৯-৬০ সালকে আমরা যদি মুদ্রামানের ক্ষেত্রে মূল বছর হিসেবে ধরি তাহলে দেখব যে ১৯৭১-৭২ সালে তা' বেড়ে ১৫০·৩ হয়েছে, অর্থাৎ ষাট দশকটার প্রতি বছরে গড়ে তা' ৫% করে বেড়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে আমরা এই বৃদ্ধির হার দেখছি ৪৬·১% এবং মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই মুদ্রাস্ফীতিটা সবচে' বেশী। জনগণের ব্যাপকতর অংশের জন্যই এই সময়-কালটি ছিল জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতি ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক অনি-শ্চয়তা। অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর ক্ষেত্রে এ সময়টা ছিল ভোগ্যপণ্যের বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে থাকা ; শিল্পে বিনিয়োগের কোনোই উদ্যোগ না নেয়া ; যুগটা আমাদের উপনিবেশোত্তর ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ের মতই ছিল এক পরগাছাবৃত্তির যুগ।

সামাজিক সঙ্কটসমূহের সংক্ষিপ্তসার

বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তির বর্তমান সঙ্কটও তার অর্থনৈতিক সঙ্কটের আলোকে দেখতে হবে। অন্য কথায় সঙ্কটটা কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক নয় (যদিও সেটাও কিছুটা রয়েছে) এবং উপরিকাঠামোর (যথা রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অস্ত্রসমূহ) সঙ্কটও একইসঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সঙ্কট তৈরী ও তীব্র করছে। কাঠামোগত সঙ্কটটা বুঝতে পারলে আমাদের কাছে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হবে।

প্রথমতঃ ভুট্টোর সংস্কারের সীমাবদ্ধতা এবং "কার্যতঃ" তাঁর সরকারের সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরতা। দ্বিতীয়তঃ এটা দেখানো যে কেন ভুট্টো ক্ষমতায় থাকাকালীন ব্যাপক জনগণ চরম-দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা 'ইসলামীকরণ'

এর প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসেনি। তৃতীয়তঃ কিভাবে 'ইসলাম'-এর নামে চরম-দক্ষিণপন্থীরা ভুট্টো সরকারের বিরুদ্ধে শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদেরকে দিয়ে একটা গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে পারল।

বর্তমানে অবশ্য বিবাদমান কর্তৃত্বশালী শ্রেণীগুলির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মোটামুটি কিছুটা স্থিত হয়েছে। আর তা' হয়েছে একচেটিয়া বুর্জোয়া[১৪], অতি রক্ষণশীল ভূ-স্বামী শ্রেণী[১৫] ও এসব শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত পেটি-বুর্জোয়া অংশগুলির পক্ষে।[১৬] অন্যদিকে আমরা দেখি যে শক্তির এই দ্বন্দ্বে সংস্কারবাদী ভূ-স্বামীরা অর্থাৎ কুলাকশ্রেণীটি, যারা পিপিপি-র ব্যানারে সংগঠিত হয়েছিল তারা এবং তাদের মিত্র প্রশাসনিক এলিট ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীটি[১৭] কিছুটা পিছু হঠেছে, হয়তো সাময়িকভাবেই। একইভাবে চরম-দক্ষিণপন্থীদের "ইসলামবাদ" সংস্কারবাদী শক্তিগুলির "সমাজতন্ত্র"-এর জায়গা দখল করে নিয়েছে। "ইসলাম" এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন একটি আধিবিদ্যক রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে যেখানে বলা হচ্ছে সমাজের সঙ্কটগুলি বর্তমান বস্তুগত সম্পর্কে সমাধান করা যাবে না এবং ফলে শ্রেণী-সংগ্রামকে রাজনীতির স্তর থেকে সরিয়ে আদর্শিক স্তরে এবং অর্থনীতি থেকে সরিয়ে কোনো এক স্বর্ণযুগের ভরসায় তুলে রাখা হ'চ্ছে। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে এই শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপটা বুঝতে আমাদেরকে অবশ্যই বর্তমান সরকারী "ইসলাম" সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটানো এবং পাকিস্তানের বর্তমান সুনির্দিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রে এর বস্তুগত ভূমিকার বিষয়টি বুঝতে হবে।

প্রথমতঃ পাকিস্তানের নিপীড়িত বিভিন্ন জাতিসত্তার উপরে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীগুলির হাতে "ইসলামী জাতিসত্তা" বিষয়টি একটি প্রধান হাতিয়ার, বিশেষ করে তেমন একটি দেশে যেখানে জাতিসত্তার দ্বন্দ্বই অনেক ক্ষেত্রে একটা শ্রেণী-দ্বন্দ্বে দ্রুত রূপ নিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এটা আর বলা যাচ্ছে না যে পাকিস্তান সকল মুসলমানদের, এমনকি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের "জাতীয় মাতৃভূমি", তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রটির বজায় থাকার যুক্তি হিসেবেও, এটা যে "ভালো" মুসলমানদের আবাসভূমি ও শেষ দুর্গ সেটা তুলে ধরার জন্যে রাষ্ট্র কর্তৃক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ইসলাম প্রচার। তৃতীয়তঃ ১৯৭১ সালেই পাকিস্তান খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে এবং এখনও তা' হতে যাচ্ছে এই দাবীর বিপক্ষে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সঙ্কট এড়ানোর লক্ষ্যে সমস্যা সামাধানে বস্তুগত সম্পর্কসমূহ থেকে "ইসলাম"-এর

দ্বারা চোখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। চতুর্থতঃ জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ নয়া-উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় শোষণ নয়, এটা দুর্নীতি, ভোগ-বিলাস, মদ, নামাজ না পড়া ও নারীজাতির বেপর্দা চলাফেরা ইত্যাদি "অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য খোদার শাস্তি" এটা প্রচারের ক্ষেত্রে "ইসলাম"-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। পঞ্চমতঃ "ইসলাম"-এর অজুহাতে বর্তমানে সরকার "দলবিহীন গণতন্ত্রে"-র কথা বলে রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করা, জনগণের ওপর নির্মম নিপীড়নকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং শারীরিক নির্যাতন (যেমন প্রকাশ্যে বেত মারা) চালানো, ইত্যাদি করতে পারছে। শেষতঃ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে আইয়ুব যুগের (১৯৫৮-৬৯) উন্নয়নবাদী মতাদর্শ কিম্বা ভুট্টোর সময়কালের (১৯৭২-৭৭) সংস্কারবাদী/সোশ্যাল-ডেমোক্রাট মতাদর্শ যে বিক্ষুব্ধ জনগণকে বশে রাখতে পারেনি, তাকে বশে রাখতে পারার শেষ অবলম্বন হিসেবেই শাসক শ্রেণীটি ধর্মকে ব্যবহার করছে। অর্থনৈতিক ঘটনাবলী এটাই তুলে ধরে যে সঙ্কটে আবর্তিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভুট্টোর "সমাজতন্ত্রে"-র সময়কালটাতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামে কিছু কিছু ছাড় দিতে পারলেও, বর্তমান সরকারের "ইসলামবাদ" হচ্ছে রাষ্ট্র সঙ্কটে পতিত হওয়ার আরো পরের ও তীব্র এক পর্যায় যখন শাসকশ্রেণীটির পক্ষে আর কোনোই ছাড় দেওয়া সম্ভব নয় এবং নির্মম নিপীড়নটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে টিকে থাকার একমাত্র উপায়। তবে এই সব পরিবর্তনের মাঝ থেকে তিনটি মূল জিনিষ বেরিয়ে আসে; যথা (ক) অর্থনৈতিক শক্তি আবার একচেটিয়া পুঁজিপতি ও তাদের মিত্রদের হাতে ফিরে যাওয়া ; (খ) মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে "ইসলামবাদ"-এর উত্থান ; (গ) সামরিক এলিটদের কর্তৃত্বাধীনে অসীম ক্ষমতার রাষ্ট্রশক্তির পুনঃস্থাপন।

মতাদর্শ এখানে আর দুর্বোধ্য, অনৈতিহাসিক কোনো "সাংস্কৃতিক" বিষয় নয়, তা' পরিণত হয়েছে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রশক্তিতে পরিবর্তন আনয়নের একটা বাস্তব শক্তিতে।

সঙ্কটগুলির মূল মূল বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত করা যাক। প্রথম ধরা যাক অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকটি। ১৯৭৭ সালের জুলাই ক্যু-এর মাধ্যমে মেট্রোপলিটন ও দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীটি ভুট্টো আমলের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাসমূহকে আরো তীব্রতর, কিন্তু আবার একইসঙ্গে তাঁর সংস্কারবাদী পদক্ষেপসমূহ বাতিল করতে সক্ষম হলো। অবশ্য ভুট্টোর সংস্কারবাদী দিকটার

অর্থ ছিল ধনী দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের মাঝে একটা র‍্যাডিক্যাল পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী রাখা যা এই দ্বন্দ্ব নিরসনে সচেষ্ট। কিন্তু জুলাই ক্যু-এর অন্যতম ফলশ্রুতি হচ্ছে ক্ষমতা থেকে মাঝের এই অংশটার অপসারণ, ফলে শ্রেণীসংগ্রাম আরো স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। আর নিপীড়নটাই বর্তমান সরকারের প্রধান রাজনৈতিক অবলম্বন হওয়ার ফলে ওই পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীটির পরিবর্তে (সামাজিক কাঠামোতে যার কিছুটা বৈধতা ছিল) বর্তমান সরকার "জামাত" ও তার উচ্চকিত দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে কাজ করতে চাইছে যা দেশে ফ্যাসীবাদের বস্তুগত ভিত্তি সৃষ্টি করছে এবং যা নিজে তেমন জনপ্রিয় না হওয়ার কারণে বর্তমান সরকারের সামাজিক ভিত্তিকেও সঙ্কুচিত করছে। মার্কস যাকে বলেছেন "সিভিল সোসাইটি", সেই তার ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার ভারসাম্য নষ্ট করা এই ক্যু-এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি। তৃতীয়তঃ পাকিস্তানে, যেখানে সামরিক অফিসারদের অধিকাংশই এসেছে একটা প্রধান অঞ্চল থেকে[১৮] এবং যেখানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম বহুলাংশেই সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামেরই একটা অংশ, সেখানে নিপীড়ন-মূলক পদ্ধতিটা দ্বারা পরিচালিত একটি "কেন্দ্রীভূত" (Centralized) রাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবীভাবেই বিচ্ছিন্ন মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে। এইসব জাতীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এই ক্যু-এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি। এই ক্যু-র চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি হচ্ছে যে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক শাসনের ফলে উপরিকাঠামোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যথা সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচার-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলসমূহ ইত্যাদি) মধ্যেকার ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কাঠামোগত সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। "ইসলামবাদ" রাষ্ট্রের শ্রেণীভিত্তিকে খুবই সঙ্কুচিত করে ফেলেছে।[১৯] আর মতাদর্শগত ক্ষেত্রে "ইসলাম" ও নিপীড়নকে সমার্থক এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমার্থক হিসেবে দেখা এই ক্যু-এর পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি। অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত, প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রের ইত্যাদি সকল সঙ্কটের ফলে ক্রমশঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈধতা সম্পর্কেই প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে দেশটির টিকে থাকার কোনো যোগ্যতা বা কারণ রয়েছে কি-না। পরিশেষে এই ক্যু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত শ্রমজীবী মানুষ, নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহ ও জনগণের অন্যান্য অংশের ক্ষোভ এবং রাষ্ট্রের মূল নিপীড়নকারী শক্তি, সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি এনে ফেলেছে।

নিপীড়নের পদ্ধতিসমূহ ও 'জামাত'

দেশে-বিদেশে খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে জেনেও পাকিস্তানী জেনারেলরা হয়তো ভুট্টোকে ঠিকই ফাঁসিতে ঝোলাবে কারণ তারা জানে যে ভুট্টো কোনদিন ক্ষমতায় ফিরে এলে তাদের নিজেদের জীবনই বিপন্ন হবে। একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। আর তা' হচ্ছে ৫ই জুলাইয়ের এই সামরিক অভ্যুত্থান কোনো ব্যক্তি-বিশেষের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি নয়, শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটা দীর্ঘস্থায়ী এক ফাটলের ফলশ্রুতি তা' যেখানে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে, "জামাত"ও রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর পরিবর্তন আনতে পুরোদস্তর প্রস্তুত হয়েই মাঠে নামে।

বর্তমানে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ১৯৭৭ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত পরিচালিত অস্থিতিশীলতার আন্দোলন ও পরবর্তীতে সামরিক অভ্যুত্থান এই সব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল চরম-দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা নির্বাচনের মাধ্যমে যাদের ক্ষমতায় আসতে পারার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। জিয়ার তথাকথিত "বেসামরিক সরকার" মূলতঃ "জামাত", মুসলিম লীগ ও জমিয়তে-উলামায়ে-ইসলামের লোকজন দ্বারা গঠিত যারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে (পাকিস্তানের প্রায় একটিই অবাধ নির্বাচন) ১৫%-এরও কম ভোট পেয়েছিল। এই কোয়ালি-শনের বড় অংশীদার "জামাত" তার বিভিন্ন গোপন কোষ, বিভাগ, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত উপরকাঠামো দিয়ে একটা ফ্যাসিস্ট ধরনের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সামাজিক যে ভিত্তি যুগিয়ে চলেছে, সংক্ষেপে সেই "জামাত" সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

"জামাত-ই-ইসলাম" সাম্রাজ্যবাদের এক বিশেষ সৃষ্টি এবং এর উন্মত্ততার পেছনে একটা সুচিন্তিত প্রক্রিয়া রয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগে তা' সকল উপ-নিবেশবিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করেছে কারণ তারা কমিউনিস্ট, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে করেছে কারণ তাতে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, মুসলিম লীগকে করেছে কারণ তার কর্মসূচী ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক নয়। সে সময় জামাত মূলতঃ ব্রিটিশদের একটা অস্ত্র, অবশ্য খুব অকার্যকরী একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এটা কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারণার প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর সঙ্গে মার্কিন যোগসাজশের ব্যাপারটি সকলেই জানেন। বাংলাদেশে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যার জন্যে

পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতায় সে এক খুনী বাহিনী তৈরী করে এবং বর্তমানে পাকিস্তানে তার চেয়ে বড় স্কোয়াড কাজ করছে।

"জামাত" সবসময়ই ছিল প্রশিক্ষিত ও সুশৃঙখল ক্যাডার সম্বলিত এক আধা-গোপন সংগঠন যেখানে সাংগঠনিক দক্ষতা ও আনুগত্যকে সংখ্যা-গত শক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। রাজনৈতিক কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরে কাজ করতে সে বেশী আগ্রহী, শহরাঞ্চলে সে বামদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি, শহরে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে রিক্রুট এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, প্রচার-মাধ্যম, মসজিদ) অনুপ্রবেশ করে থাকে। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সে এক বিশেষ ধরনের ইস-লামী মৌলবাদে বিশ্বাসী যা মার্কিনপন্থী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে এবং শক্তিশালী কেন্দ্রসহ একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে। সামাজিক ভিত্তির ক্ষেত্রে জামাত মূলতঃ লুম্পেন ও পেটি-বুর্জোয়া অংশসমূহ, যেমন ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, কর্মচারী এবং নীচুস্তরের আমলাদের ওপর, অন্য কথায় পেটি-বুর্জোয়াদের সেই অংশের মধ্যে ছড়ানো যারা মূলতঃ পুঁজির সঞ্চালনের সঙ্গে জড়িত। তবে জামাত সব সময়ই মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রগুলি, যেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও প্রচার-মাধ্যমের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং ফ্যাসিস্ট সংগঠনের মতোই বিপ্লবী বামপন্থীদের চিহ্নিত করা এবং অনুপ্রবেশকারী, প্ররোচনাদানকারী, পেশাদার গুণ্ডা ও খুনীদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এদের নানারকম গোপন কোষ রয়েছে। বিভিন্ন রকম শ্রেণীর সমাবেশ ঘটলেও "জামাত" পাকিস্তানের মূলতঃ সেই পেটি-বুর্জোয়া অংশের অস্ত্র যারা পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রান্তস্থ পুঁজিবাদের বিকাশ (যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ঠিকাদারী, আমলাতন্ত্রের প্রসার ইত্যাদি) দ্বারা লাভ-বান হয়েছে এবং পাকিস্তানে রাজনীতি র‍্যাডিকাল হয়ে পড়লে যাদের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় তারা তাদের প্রান্তিক লাভ ক্ষয় পেতে দেখেছে এবং দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে তারা ভুট্টোর "সমাজতন্ত্র"-কে দায়ী করে থাকে। এই শ্রেণীটি "শুধুই" সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের দালাল নয়। আধুনিক শ্রেণী-সমাজে বিভিন্ন কর্তৃত্বশালী শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত এই পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীটি নিজেও একটি শ্রেণীর বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে। পেটি-বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশ যে "জামাত" ও তার চরম দক্ষিণপন্থী ভাবধারার দিকে

ঝুঁকল তার মূলতঃ তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ পিপিপি সরকার ও এর মধ্যস্থিত পেটি-বুর্জোয়া অংশটি সমগ্র পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীটার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেনি, বিশেষ করে বেতনভুক কর্মচারী অংশটির, এবং যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে লড়াই করার কোনো রাজনৈতিক প্লাট-ফর্ম এর নেই, ফলে সে তার শ্রেণী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দক্ষিণ দিকে ঝুঁকেছে। দ্বিতীয়তঃ পেটি-বুর্জোয়াদের সাথে সম্পর্কিত রইবে, বুর্জোয়াদের দ্বারা এরকম একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যর্থতা এই শ্রেণীটির জন্যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল যারা তাদের শ্রেণী-চরিত্র অনুযায়ীই এমনিতেই ফ্যাসিস্ট দলগুলোর প্রতি দুর্বল রয়। (এ প্রসঙ্গে এটা বলা যেতে পারে যে "তেহরিক-ই-ইস্তেকলাল"-ই ছিল পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের কর্তৃক সম্পূর্ণ একটা নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ার একমাত্র প্রচেষ্টা। এমনকি ক্যু-এর আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-যন্ত্র "তেহরিক"-এর নেতা আসগর খানের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দিয়েছে এবং "দি টাইমস অব লণ্ডন" তো তাকে "প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য" ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনাই করেছিল। এমনকি সেনাবাহিনীও তখন পর্যন্ত "তেহরিক" ও "জামাত"-এর মাঝামাঝি একটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছিল। তবে সেনাবাহিনীর ভেতরেই "জামাত" অংশটি নেতৃত্বে চলে এলে "তেহরিক" ক্রমশঃ পিছনে সরে যায়)। তৃতীয়তঃ জাতিসত্তার প্রশ্নগুলি, বিশেষ করে বেলুচিস্তানে, খুব তীব্র হয়ে উঠলে নেতৃত্বশালী জাতিসত্তার পেটি-বুর্জোয়া অংশটি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় পাকিস্তান ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নিপীড়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহের সমর্থক হয়ে পড়ে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৫%-এরও কম ভোট পাওয়ার পর জামাত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। বরং একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো ও তার জন্যে সামাজিক একটা প্রক্রিয়া তৈরীর ক্ষেত্রেই তারা বেশী আত্মনিয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ তারা সেনা-বাহিনীর মধ্যে তাদের প্রচারণা শুরু করে এবং কয়েকটি কারণের জন্যে সেখানে ভাল সাড়া পায়। ব্রিটিশ-প্রশিক্ষিত, ধর্মনিরপেক্ষ অফিসারদের তুলনায় পরবর্তীকালে এল স্বল্প শিক্ষিত ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত এক ধরনের অফিসার। মূলতঃ পূর্ব পাঞ্জাব থেকে আগত শরণার্থী অফিসাররা (যারা জুলাই কুৎ-র হোতা) ও অ-জলসেচকৃত পটওয়ার এলাকা থেকে আগত অফিসারদের মধ্য থেকে কিছু জেনারেল সৃষ্টি হলো যারা সামাজিক-

ভাবে রক্ষণশীল এবং গোঁড়া ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতি, ঠিক যে সব কথাবার্তা "জামাত" বলে থাকে, তার প্রতি দুর্বল। একইভাবে জওয়ান ও ছোটো অফিসারদের নিয়োগের ধারাতেও পরিবর্তন ঘটেছে। আগে যেমন এরা আসত মূলতঃ মধ্য-পাঞ্জাবের সমৃদ্ধশালী কৃষকশ্রেণী থেকে, কিন্তু এখন আসতে থাকে উত্তরের জেলাগুলোর দেউলিয়া-হয়ে-পড়া কৃষকশ্রেণী থেকে যাদের মধ্যে পশ্চাৎপদ ও গোঁড়া ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা বেশী প্রতিফলিত হয়। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশে (১৯৭১ সালে) চরম পরাজয়ের ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল তা' "জামাত" কর্তৃক প্রচারিত ভবিষ্যতের এক অবাস্তব স্বর্ণযুগের প্রতি আশ্বস্ত হয় এবং জওয়ানদের মধ্যে মার্কসবাদী বাম-পন্থী গ্রুপগুলোর মতাদর্শগত কোনো প্রচার চালানোর ব্যর্থতা "জামাত"-এর মতাদর্শ সৈনিকদের মাঝে প্রচার ও গ্রহণ করানো সহজ হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যপ্রাচ্যের রাজ্যসমূহ যথা সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের ঘনিষ্ঠতা মতাদর্শক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। আর সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা' হচ্ছে ব্যাপকসংখ্যক সৈনিকদের মধ্যে জামাতের মতাদর্শ প্রচার ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার ও অন্যান্য উচচপদস্থ অফিসারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। জেনারেল জিয়া, যে আবার পাকিস্তানের "জামাত"-এর প্রধান মিয়া তোফায়েলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেনাবাহিনীর মধ্যে "জামাত"-এর গোপন কোষসমূহকে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র "জামাত"-এরই এই সুযোগ ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে "জামাত" সাফল্যজনকভাবেই প্রতিটি বেসামরিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করছে। সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় ভাষার পত্র-পত্রিকার প্রতি "জামাত" বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একটা লক্ষ্য হচ্ছে সুদূরপ্রসারী মতাদর্শগত প্রচার এবং আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্ররা ও পত্রিকাগুলো একটা গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে, যেরকম "গণ-আন্দোলন" ১৯৭৭ সালের সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের অজুহাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল। "জামাত"-এর ছাত্র-সংগঠন "জমিয়ত" হচ্ছে বর্তমানে দেশের সবচে' বৃহত্তম ও সুশৃংখল সংগঠন। বছরের পর বছর ধরে অধ্যবসায়, এলিট ক্যাডারদের বিকাশ, এর সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদান, প্রচুর তহবিলের সরবরাহ এবং বিরোধী ছাত্রদের

বিরুদ্ধে সংগঠিত সন্ত্রাস চালিয়ে এই কর্তৃত্বটা তারা অর্জন করতে পেরেছে। একইভাবে দেশীয় ভাষার পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও "জামাত"-এর কর্তৃত্ব বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে উর্দু সাময়িকী 'উর্দু ডাইজেস্ট", সাপ্তাহিকের মধ্যে "জিন্দেগী", সৈনিকের মধ্যে "নয়া-ই-ওয়াক্ত" সহ আরো কিছু পত্র-পত্রিকা। ছাত্র সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও দেশে রয়েছে অসংখ্য মসজিদ যার মাধ্যমেও "জামাত" তার মত প্রচার ও ক্যাডার সংগ্রহের কাজ করে থাকে। এইসব কারণেই সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সামাজিক ভিত্তি না থাকলেও "জামাত" নতুন "সরকার"-এ তার অবস্থানকে বৈধ করার মত শক্তিশালী।

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হওয়া বর্তমানে দুইটি কারণে অসম্ভব। প্রথমত: সরকার যতই একে বিলুপ্ত করে দেয়ার প্রচার চালাক না কেন, পিপিপি এখনও পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম দল। দ্বিতীয়ত:, শাসক জান্তার প্রধান পরামর্শদাতা "জামাত" এখনও ভুট্টো-বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও সবচে' বড় নয়, "তেহ্‌রিক" ও "এন ডি পি" নি:সন্দেহে এর চেয়ে বড় দল। তাই ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনে হলে তাতে প্রচুর কারচুপি করলেও "জামাত" নির্বাচিত পরিষদে কর্তৃত্বের অবস্থানে আসতে পারবে না। ফলে রাষ্ট্রের উপরে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তাকে আরো ব্যাপকভাবেই নিপীড়নমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে এমনকি গোঁড়া মুসলমানদের মাঝেও "জামাত" সংখ্যালঘু। তার নিজের ধারার "ইসলাম" অন্যদের উপর চাপানোর জন্যে তাকে রীতিমত নির্মম নিপীড়নের আশ্রয় নিতে হয়।

আমরা সঠিক বলতে পারি না যে কদ্দিন আর এই সংখ্যালঘুদের-মাঝে-সংখ্যালঘু সরকারটি টিকে থাকবে। আমরা এটাও বলতে পারি না স্বৈরতন্ত্র বেশীদিন টিকবে, না পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ততদিন টিকবে। বর্তমানে অবশ্য "জামাত"-এর নেতৃত্বাধীন চরম-দক্ষিণপন্থীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রধান বিরোধী দল পিপিপি-কে ধ্বংস করা। এই লক্ষ্যে এক ব্যাপক নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ছয় ডিভিশন সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছে। শুধুমাত্র সিন্ধুতেই রয়েছে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ রাজনৈতিক বন্দী। এক হিসেবে বর্তমানে পিপিপি-এর ১০,০০০ সদস্য কারাবন্দী রয়েছে যার মধ্যে দলের নেতৃবৃন্দও রয়েছেন। ১৪ই অক্টোবর রাতে, পিপিপি কর্তৃক আহূত পরদিনের "প্রতিবাদ দিবস" রোধ করতে শুধুমাত্র লাহোরেই ৩,০০০ জনকে

গ্রেফতার করা হয়। প্রায় দশজন বন্দী নিজেদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করে আত্মাহুতি দিতে চায়। এর মধ্যে চারজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এছাড়া রাজনৈতিক বন্দীদেরকে বেত্রাঘাত করা তো একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি প্রকাশ্যে শ্লোগান দিলেও।

চরম দক্ষিণপন্থীদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে প্রশাসনিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রগুলোতে কর্তৃত্ব অর্জন করা। সে লক্ষ্যে সীমিত আকারে হলেও বহু বহিষ্কার, বদলী ও নতুন লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। বহুদিন ধরেই জামাত জীবনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে সরকারী অফিস, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও প্রচার-মাধ্যমে গোপন কোষসমূহ চালিয়ে এসেছে। বর্তমানে এইসব গোপন কোষগুলি সরকারের চোখ ও কান হিসেবে কাজ করছে এবং "জামাত"-এর আধা-সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। জিয়ার তথাকথিত বেসামরিক সরকারের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগও দ্রুত গোপন কোষসমূহ বৃদ্ধি করছে। "জামাত"-এর খুনে বাহিনীগুলো সারাদেশে ছাত্রদের মাঝে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ছাত্রদের ইউনিয়নসমূহের নেতৃত্ব দখল করছে। অপর সঙ্গী মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে বড় শহরগুলিতে "জামাত" পিপিপি-র মিছিল-সমূহের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে।

উপসংহার

সেনাবাহিনী যেভাবে "জামাত"-এর ফ্যাসিস্ট সংগঠনের সঙ্গে একাত্মতা বৃদ্ধি করছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ক্রমাবনতি ঘটছে, রাষ্ট্রশক্তি যেভাবে 'সিভিল সোসাইটি', বিশেষ করে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, বিচার-ব্যবস্থা যেভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং নির্যাতন যেভাবে ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে তাতে একটা বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক ব্যবস্থার আওতায় এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে শাসকশ্রেণী শাসন করার সকল যোগ্যতা ও বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু দেশে এখন এমন কোনো সংগঠিত বিপ্লবী শক্তি নেই যারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা নিতে পারে। তবে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বা তার সাহায্য নিয়েও বর্তমান সরকারকে উল্টে দিয়ে পিপিপি বা ওই জাতীয় কোনো শক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টার একটা পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে

দেয়া যায় না। সেনাবাহিনীর ভেতরকার বর্তমান দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট জানি না। তবে এ ধরনের একটা শক্তি ছাড়া পাকিস্তানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

টীকা

১. "পাকিস্তান নিউজলেটার", খণ্ড ১, সংখ্যা ৫, মার্চ ১৯৭৭, নিউইয়র্ক।

২. একটা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে দেখুন "মেরিপ রিপোর্টস", সংখ্যা ৫৮, জুন, ১৯৭৭।

৩. দেখুন "পাকিস্তান ফোরাম", করাচী, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮।

৪. "আল-ফাতাহ্", করাচী, ৬ই জানুয়ারী ১৯৮০।

৫. জে. এম. খার, নওয়াব কুরেশী, শেরপাও, জাতোই ও মমতাজ ভুট্টো ভূ-স্বামী গ্রুপের নেতৃত্ব দেয়। বেলুচিস্তানে নওয়াব বুগতি একজন ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো পিপিপি-তে যোগ দেননি।

৬. "ন্যাপ"-এর একটি দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে এবং তা' অনেকখানিই স্বল্প-পরিচিত "পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি" (সিপিপি)-র ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৫১ সালে সিপিপি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে পার্টি তার কর্মীদের সে সময়কার প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের মধ্যে গণসংযোগ ও বাম অংশটাকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করতে পাঠায়। উদ্দেশ্যটা ছিল যে আওয়ামী লীগের মধ্যে যদি বাম অংশটা শক্তিশালী হয় এবং আওয়ামী লীগ যদি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে তাহলে পাকিস্তান "জাতীয় গণতন্ত্র"-এর স্তরে প্রবেশ করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টি তার বৈধ অস্তিত্ব ফিরে পাবে (এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ পাবে।) আওয়ামী লীগ স্বল্পকালের জন্যে ক্ষমতা পেয়েছিল বটে, কিন্তু তা' পেয়েছিল এর দক্ষিণ অংশের নেতা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যিনি পাকিস্তানকে আরো বেশী করে সাম্রাজ্যবাদের কব্জায় নিয়ে ফেললেন। মওলানা ভাসানী কমিউনিস্ট ও বাম অংশটা নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে "ন্যাপ" গঠন করলেন যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তানে একটা ব্যাপক গণভিত্তিসম্পন্ন দলে পরিণত হলো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর আকার ছোটই থেকে গেল। ১৯৬৭-৬৮ সালে পুনর্বার ভাঙনে, যখন অতি-বামপন্থীরা এ দলটি ছেড়ে গেল তখন "ন্যাপ" আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। ফলে "ন্যাপ" পাকিস্তানে মূলতঃ হয়ে দাঁড়াল সোভিয়েটপন্থী কমিউনিস্টদের (গোপন কমিউনিস্ট পার্টি) ও সরহাদ ও বেলুচিস্তানের ভূ-স্বামীদের একটা ঐক্যফ্রন্ট। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে এই দুই অংশেরই কিছুটা প্রভাব ছিল। বেলুচিস্তানে অবশ্যই "ন্যাপ" একটা বড় সংগঠন হয়ে দাঁড়ায় যার ছায়ায় বালুচ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সিপিপি

ছাড়াও অন্যান্য মার্কসবাদীরাও ক্রমে জড়ো হন। ১৯৭৫ সালে "ন্যাপ" নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরে পাঞ্জাবের কুখ্যাত ভূ-স্বামী শের বাজ মাজারীর নেতৃত্বে "ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি" (এন্ ডি পি) নামে তা পুনরাবির্ভূত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রতি সহানুভূতিশীলদের দল থেকে বের করে দেয়া হয় এবং বালুচ জাতীয়তাবাদীরা এই দলে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকে। এর সর্বশেষ রূপে "ন্যাপ" অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশী ভূ-স্বামীকেন্দ্রিক এবং এর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি আগের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণতর।

৭. "জে ইউ আই" বা "জমিয়তে-উলামায়ে-ইসলাম" সরহাদের কিছু জেলা এবং বেলুচিস্তান ও করাচীর পশ্‌তু-ভাষী কিছু জনগণের মধ্যে সীমিত একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন। সামাজিক দিক থেকে "জে ইউ আই" গ্রামের মাঝারি ও ধনী কৃষকদের এবং তাদের মধ্যেকার গরীব-হয়ে-যাওয়া শহুরে অংশটির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এর কর্মসূচীতে তাই সামন্তবিরোধী ও মনোপলি বুর্জোয়ার বিরোধী কিছু ঝোঁক রয়েছে। এর দক্ষিণপন্থী জঙ্গীপনার দিক থেকে মিশরের "মুসলিম ব্রাদারহুড"-এর কিছু অংশের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। তবে গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে দলটি ক্রমশঃই চরম দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁক্ছে।

৮. শুধুমাত্র ১৯৭৫ সালের বসন্তকালেই করাচী-হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে ৩৫,০০০ টেক্স-টাইল শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।

৯. "রিপোর্ট অব দি ল্যাণ্ড রিফর্ম কমিশন", লাহোর, ১৯৫৯।

১০. "পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে", ১৯৭৫-৭৬, ফিন্যান্স ডিভিশন, পাকিস্তান সরকার।

১১. ঐ।

১২. "পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে", ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ১৭৮-৯।

১৩. ১৯৭২ সালে ঋণ প্রদানের শর্ত হিসাবে "আই এম এফ" ভুট্টো সরকারকে প্রায় তিনশত পণ্যের উপর থেকে আমদানী নিষিদ্ধের আইন তুলে নিতে বাধ্য করে। এভাবে সংরক্ষণের নীতি বাতিল করা ও মুদ্রামান ১৩০% হ্রাস করার ফলে বিদেশী ভোগ্যপণ্যের আমদানী বাড়ল এবং দেশী শিল্প প্রচণ্ডভাবে মার খেল।

১৪. আইয়ুব খানের একজন নিকট আত্মীয় ও একচেটিয়া বুর্জোয়াদের একজন প্রতিনিধি জেনারেল হাবিবুল্লাহ, যাকে ভুট্টো হাতকড়া পরিয়ে টেলিভিশনে দেখিয়েছিলেন, জিয়ার ক্যু-র পরপরই জিয়ার শিল্পনীতির একজন উপদেষ্টা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। হোতির নওয়াব, একজন প্রকৃত আধা-সামন্তবাদী ভূ-স্বামী যিনি নিজেকে একজন একচেটিয়া বুর্জোয়ায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, জিয়ার মন্ত্রীসভায় কিছুদিনের জন্যে শিক্ষামন্ত্রী হন। এটা জানা যায় যে, ভুট্টোর আমলে জাতীয়-করণকৃত বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মালিক হাবিব ও সায়গলরা আবার ব্যক্তি-মালিকানায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্সের জন্যে জিয়া সরকারের সঙ্গে দেন-

দরবার করছে। জিয়া নিজেও শিল্প ও বাণিজ্যকে আইয়ুবী স্বৈরতান্ত্রিক আমলের "স্বর্ণযুগে" ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন, যে যুগটাতে একচেটিয়া পরিবারগুলো পাকিস্তানের গোটা সামাজিক পুঁজির উপর প্রথম কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে এটা সবাই জানেন যে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানাগুলি আবার ব্যক্তি-মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বর্তমান সরকার বিশদ পরিকল্পনা নিয়েছে।

১৫. এল ডি পি-র সভাপতি শের বাজ মাজারি, মুসলিম লীগের সভাপতি পীর পাগরো, "তেহ্‌রিক"-এর একজন প্রধান নেতা নওয়াব বুগতি হচ্ছেন খোলা-মেলাভাবে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চ ধনী-ভূ-স্বামী শ্রেণীর প্রতিনিধি।

১৬. যদিও "জামাত" মূলতঃ এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে, তবুও পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন অংশ "পি এন এ"-র প্রায় সকল দলের মাঝেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতেই এই শ্রেণীটি বেশী মাত্রায় প্রভাবশালী। "জামাত" ও বহু নেতৃস্থানীয় সামরিক অফিসারদের মধ্যে যোগসাজশের ব্যাপারটি কোনো আপতিক বা শুধু ষড়যন্ত্রমূলক নয় (যদিও ষড়যন্ত্রের অংশটিও বিদ্যমান), এর শ্রেণীকাঠামোগত কারণ বিদ্যমান।

১৭. পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা এখনও গড়ে-ওঠার পর্যায়ে রয়েছে ; অন্তত নাসেরের মিশর বা বুমেদীনের আলজেরিয়ার রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের মত তা' পূর্ণ বিকশিত শ্রেণী হয়ে উঠতে পারেনি। আর যেহেতু এটা এখনও পূর্ণ বিকশিত একটা শ্রেণী নয়, তাই সে ব্যক্তি পুঁজিপতিদের বিরোধিতা করে নয়, তাদের সঙ্গে মিলেমিশেই কাজ করে।

১৮. আঞ্চলিক উৎস ও কুলাক ব্যাকগ্রাউণ্ডই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা ও আচরণের উৎস। বস্তুতঃ এই গোটা শ্রেণীটিরই সৃষ্টি ঔপনিবেশিক কালটাতে এবং তাদেরকে নিপীড়নের একটা অস্ত্র হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের "স্বাধীনতা"-র পর নয়া-উপনিবেশবাদী যুগের জন্যে এই সেনাবাহিনীটিকে তৈরী করতে পাঁচ হাজার বৃটিশ অফিসার পাকিস্তানে রয়ে যায় এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্তও দুই হাজার জন থেকে যায়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এরপর পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কুখ্যাত সামরিক মৈত্রীজোটসমূহে যোগ দেয়, ১৯৫৪ সালে "সিয়াটো"-তে এবং ১৯৫৫ সালে "সেন্টো"-তে। ফলে অফিসারদের এলিট অংশের প্রায় সকলেই মার্কিন ট্রেনিং-প্রাপ্ত। পরিবর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনী জর্ডানে প্যালেস্টাইনীদের উপর গণহত্যা চালানো ও দোফার বিপ্লব ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া উপসাগরীয় তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে প্রশিক্ষণ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকাও (বিশেষ করে যুক্ত আরব আমীরাতে) যে পাকিস্তান বাহিনী রাখছে সে প্রসঙ্গে আর নাই বা গেলাম।

১৯. সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় তাবেদাররা যে কথাই বলুক না কেন, পাকিস্তানের কৃষকদের মধ্যে যে ধারার ইসলাম বিদ্যমান তা' মূলতঃ গোঁড়ামীপূর্ণ নয়। গোঁড়া মৌলবাদী ইসলাম কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয়, মূলতঃ পশতু কৃষকদের মাঝে। এটাই কারণ যে পাকিস্তানের গোঁড়া ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলি গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মাঝে কখনোই দৃঢ়ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি। "জে-ইউ আই" হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম এবং তাও তার প্রভাব মূলতঃ পশতু কৃষকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রশ্নে মৌলবাদ নয়, "জে-ইউ আই"-এর কুলাক-ভিত্তির রাজনীতিও এক্ষেত্রে অনেকখানি অবদান রেখেছে। ফলে দেখি যে ১৯৭০-এর নির্বাচনে মৌলবাদী ধর্মীয় দলগুলি সব কয়টি মিলেও ১৫% এরও কম ভোট পেয়েছে এবং সীট পেয়েছে শতকরা হিসেবে এর অর্ধেক এবং তাও মূলতঃ পেয়েছে পেটি-বুর্জোয়াদের সমর্থন পেয়ে। এছাড়া সামরিক শাসন ও চরম দক্ষিণপন্থী অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের সঙ্গে যেভাবে গোঁড়া ইসলাম একাত্ম হয়ে জনগণের সামনে দেখা দিচ্ছে, তাতে এটুকু সমর্থনও ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

বিলাল হাশমী

পাকিস্তানে রাষ্ট্রক্ষমতায় সেনাবাহিনী বিষবৃক্ষ*

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতীত কথা

১৯৭৯-৮০ সালে ৪২৯,০০০ শক্তিসম্পন্ন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর (যার মধ্যে ৫,০০০ জনের মত ক্যাপ্টেন বা তার উপরের অফিসার) ইতিহাস ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসের মাঝে নিহিত।[১] একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনীর, বিশেষ করে এর এলিট শ্রেণীর ইতিহাস খুঁজতে আমাদেরকে কম করে হলেও ১৮৫৭ সালে ফিরে যেতে হবে যখন ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ্ থেকে বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল।

যেসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে এসেছে, শুধুমাত্র সেইসব দেশের ক্ষেত্রেই সামরিক আমলাতন্ত্রকে একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যেসব দেশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ্ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেইসব আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই অভিধা সঠিক হবে না। বস্তুতঃ তার জন্মলগ্ন থেকে (ব্রিটিশ) ভারতীয় সেনাবাহিনী "আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবক" এবং এই উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের বিনিময়ে ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বদাই এই কথাটার উপর জোর দিত যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল ও দক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব শুধুমাত্র যদি একে ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংগঠিত করা যায়। কিন্তু এটা কোম্পানীর ভাগ্যের জন্য একটা পরিহাস ও বিস্ময়ের ব্যাপার হোল যখন এই নীতির ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেল, রাজনৈতিক চেতনা বাড়ল এবং অবশেষে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের জন্ম

*বিলাল হাশমী রচিত "ড্রাগন সীড : মিলিটারী ইন দি স্টেট" প্রবন্ধ।—অনুবাদক

দিল। এর পর থেকে এই নীতি বাতিল করা হোল। পরিবর্তে ১৮৫৯ সালে রাজকীয় ব্রিটিশ সরকার সুপারিশ করল যে, "বিভিন্ন জাতিসত্তা ও বর্ণের সমন্বয়ে ভারতীয় বাহিনীকে গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতিটি রেজিমেন্টেই বিভিন্ন ধরনের ভারতীয়দের সমন্বয় ঘটাতে হবে।"[২] তাছাড়া "ভাগ কর ও শাসন কর" নীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার মুসলমান ও হিন্দু এবং হিন্দু ও শিখদের বিদ্যমান ধর্মীয় বৈরিতা থেকে পুরো ফায়দা ওঠাতে সচেষ্ট থাকে। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্য নিয়োগের এক নির্দেশিকা থেকে এর প্রমাণ মেলে। এতে বলা হচ্ছে, "শিখ রেজিমেন্টকে পাঞ্জাবে রাখ, তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত থাকবে, হিন্দুদের পাঞ্জাবের বাইরে রাখ, তারা শিখদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত রইবে।"[৩]

এই সাংগঠনিক নীতিমালা দ্বারা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজটি মূলতঃ "আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা"র মধ্যে সীমিত রাখা হয়। এক জাতিসত্তা বা ভাষাভাষীর বাহিনীকে আরেক জাতিসত্তা ও ভাষাভাষীর অঞ্চলে রেখে ব্রিটিশরাজ "আইন শৃঙ্খলা" রক্ষা করত। তাই যদিও ব্রিটিশরাজের স্বার্থ অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতীয় বাহিনী অবদান রেখেছে তবে তা পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বৈরিতা বৃদ্ধিও করেছে।

চারপাশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ এবং রাজনীতি ও জাতীয় সংস্কৃতি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন রাখারও নানাবিধ চেষ্টা চলে এসেছে। তাই নেটিভ সেনাবাহিনীর জন্যে ব্রিটিশরাজের সাংগঠনিক নীতি ছিল, "তাদেরকে যতটা সম্ভব সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় আবেগ ও স্বার্থ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে এমনভাবে নিয়োগ ও গঠন করা যেন গোলযোগ ঘটলে তারা এসবের বিপক্ষে কাজ করে।"[৪]

১৮৫৯ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত অফিসার হিসেবে ভারতীয়দের নিয়োগ খুবই সীমিত ছিল এবং তা ভারতীয় সমাজের সবচে' রক্ষণশীল অংশটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুষ্টিমেয় কিছু ভারতীয় অফিসার-পদ পেয়েছিল, শুধুমাত্র তারা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে গিয়ে রাজকীয় সরকারের প্রতি তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করেছিল বলেই। তাছাড়া তখনও ভারতীয়দের অফিসার পদ প্রদানের ব্যাপারটি ছিল প্রায় প্রতীকধর্মী। তাদের ব্রিটিশ সহকর্মীরা যে ক্ষমতা ভোগ করত তা' তাদের ছিল না। এক সূত্র অনুযায়ী

১৯০০ সালে ২,৯২৩ ছিল "নেটিভ অফিসার" যার মধ্যে "রিসালদার-মেজর" ও "সুবেদার মেজর" পদসমূহও রয়েছে, যাদেরকে শুধুই "সম্মান-সূচক অফিসার" বানানো হয়। রিসালদার-মেজর ও সুবেদার-মেজর পদসমূহ (যেসব পদ এখনও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে রয়েছে) যদিও নন্‌কমিশন্‌ড পদ, তবুও (ব্রিটিশ) ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন চাকুরী এবং "সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন দেশীয় ভদ্রলোক" হওয়ার কারণে তাদেরকে এই "সম্মান-সূচক অফিসার"-এর পদ প্রদান করা হয়। সম্মানসূচক এসব অফিসার ও ওইসব প্রতীকর্মী পদ, যেমন "দেহরক্ষী" বা "সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান হর্স", যারা মূলতঃ ব্রিটিশ ভাইসরয় ও গভর্নরদের কর্তৃতাধীন, বাদ দিলে ১৯০০ সালে মোট দেশীয় অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৮০।[৫]

সেনাবাহিনীর ভারতীয় অংশের মধ্যে এবং জায়মান শিক্ষিত শ্রেণীটির জাতীয়তাবাদী দাবীর কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালে ভারতীয়দের আরো বেশী সংখ্যায় কমিশন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য শুধুমাত্র "প্রাচীন অভিজাত পরিবারগুলিকেই এই কমিশন প্রদান করা হোত এবং এই কনশেসন দেওয়ার উদ্দেশ্যটা ছিল এদেরকে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে আরো "ঘনিষ্টতর ও আন্তরিক বন্ধন"এ আবদ্ধ করা। এই পদক্ষেপটা ছিল একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ। যোগ্যতার মাপকাঠি এখানে ছিল না এবং এটা সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যে, "এই পরিকল্পনার সামরিক বিষয়ের চেয়ে রাজনৈতিক কারণ বেশী।"[৬]

ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সংখ্যা ১৯১৫ সালের ১৫৫,০০০ থেকে ১৯১৮ সালে ৫৭৩,০০০ এবং ১৯২০ সালে ৬২৪,০০০ হলেও,[৭] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরটির আগে পর্যন্ত ভারতীয় সৈনিকদের পক্ষে রাজকীয় কমিশন পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যার ফলে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ভারতীয় সৈনিকদের ক্ষোভ যে তাদের ইংরেজ সহকর্মীদের মত প্রমোশন পাওয়ার সুযোগ নেই এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান চাপ, ব্রিটিশ সরকারকে ১৯১৮ সাল থেকে ভারতীয়দেরও রাজকীয় কমিশন প্রদানে বাধ্য করে।

যদিও ১৯১৮ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতের ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার জন্যে ভারতীয় সৈনিকরাও ইংল্যাণ্ডের স্যাণ্ডহার্স্ট রয়েল মিলিটারী কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে, তবুও

তাদের মনোনয়নটা পুরোপুরিই নির্ভরশীল ছিল ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণর বা ভাইসরয়দের উপর। ১৯২৮ সালে অবশ্য এই পদ্ধতির পরিবর্তন করা হোল এবং প্রতিযোগিতামূলক একটা পরীক্ষা ও পরে বিশদ একটা মৌখিক পরীক্ষার পর অফিসার ক্যাডার প্রার্থীদের রিক্রুট করা শুরু হোল। ফলে ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত, শুধুমাত্র একটি সীমিত অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মাঝেই রাজকীয় কমিশন যাতে সীমাবদ্ধ থাকে, তা' দেখা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল। প্রতি বছর দশজন ভারতীয় সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য স্যাণ্ডহার্স্টে যাবে, ১৯১৮ সালে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৮] ১৯২৮ সালে এই সংখ্যা ২০ এ বাড়ানো হলেও, যে সময়টাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সিনিয়র অফিসাররা প্রশিক্ষিত হয়, ব্রিটিশ সরকার কতখানি আসন প্রদান করে তার ওপরই বিষয়টি নির্ভরশীল ছিল।[৯]

ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতে ভারতীয় অফিসারদের গ্রহণের কারণ শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয়, "রাজকীয় সরকারের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাবের কারণেও।" এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে,

"যুদ্ধ পরবর্তী জঙ্গী জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক অসন্তোষ সরকারের পক্ষ থেকে তীব্র নিপীড়ন ও কিছু সংস্কারের ইচ্ছার জন্ম দিল। রুশ বিপ্লবের প্রভাব যে রকম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর পড়েছে, তেমনই তা 'রাজকীয় সরকারের ভীতিকেও বৃদ্ধি করল। এটা একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে ভারতীয় অফিসারদের গ্রহণ একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী চাহিদাকে তুষ্ট করা অন্যদিকে "বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে"র প্রয়োজন অনুযায়ী একটা কার্যকর সেনাবাহিনী তৈরীতে সাহায্য করা।"[১০]

তবে সেনাবাহিনীর এই ভারতীয়করণ ছিল খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। এক সূত্রে প্রকাশ ১৯২৩ সালে মাত্র ৮০ জন ভারতীয় কমিশন্ড অফিসার ছিলেন। প্রস্তাব করা হয় যে সেনাবাহিনীর পূর্ণ ভারতীয়করণের জন্য এরকম ২,০০০ অফিসার লাগবে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এই লক্ষ্য পূরণ জরুরী মনে করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার মনে করত যে, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত "রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান" নির্ভর করছে "সেনাবাহিনীর সমস্যার সমাধান"-এর ওপর। এবং যেহেতু সেনাবাহিনীর ভারতীয়করণ ধীরগতিতে চলছিল তাই ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ সরকার বলে যে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসনের জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দাবীকে অপেক্ষা করতে হবে

যতদিন না সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি ভারতীয়করণ করা না যাচ্ছে।[১১]

সেনাবাহিনীর ভারতীয়করণের ক্ষেত্রে এত ধীরগতির স্বপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের অজুহাত ছিল যে "ভারতীয় তরুণদের" মধ্যে "নেতৃত্ব ও সৈনিকসুলভ" গুণাবলীর অভাব রয়েছে যা "ব্রিটিশ ভদ্রলোক"-দের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ১৯২৪ সালে এই প্রসঙ্গে বলা হয় যে,

"যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি অধিকাংশ ভারতীয় বালকের মধ্যে দেখা যায় না, সেই নেতৃত্বের প্রতি ও সৈনিকপনার প্রতি ভালবাসা আজকের দিনের ব্রিটিশ পাবলিক স্কুলের বালকদের একটি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ...সৈনিকবৃত্তির প্রতি এবং ইউনিটের লোকদের নেতৃত্ব দেয়ার প্রতি আকর্ষণের কারণেই "তরুণ ব্রিটিশ ভদ্রলোকেরা" ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে। অন্যদিকে "ভারতীয় যুবকেরাও" বর্তমানে সেনাবাহিনীতে ঢুকলেও তারা তা করে থাকে মূলতঃ যাদের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল সেই ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা এবং রাজকীয় কমিশন পেলে তার স্বদেশবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তার যে "ইজ্জত" (সম্মান) বাড়বে, এই কারণে।"[১২]

ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয়দের সেনাবাহিনীতে ঢোকার ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীর উচ্চপদে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের যত কম সুযোগ প্রদান। অবশ্য এ ব্যাপারটি ভারতের পাঠান, বালুচ, জাট, মারাঠা, শিখ, পাঞ্জাবের মুসলমান ও নেপালের গুর্খাদের[১] সম্পর্কে তারা যে "সামরিক জাতি"-র কল্পকথা তৈরী করেছিল, তার বিপক্ষেই যায়। তবে যদিও অফিসারদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের একচেটিয়া বজায় রইল, সৈনিকদের মূলতঃ এইসব তথাকথিত "সামরিক জাতি"-সমূহ থেকেই নিয়োগ করা হোত। এর ফলে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চলগত প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ১৯২৯ সালে ভারতের মোট সেনাবাহিনীর ৫৪% ছিল পাঞ্জাবের এবং নেপালের গুর্খাদের বাদ দিলে পাঞ্জাবের পরিমাণ ছিল ৬৭%।[১৪] পাকিস্তান সৃষ্টির পরও এই আঞ্চলিক প্রাধান্যের ব্যাপারটি বজায় থাকে। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকেই সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক নেয়া হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তানের পরিমাণ ছিল খুবই যৎসামান্য। মুষ্টিমেয় যেসব ভারতীয়, যারা ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর "নেটিভ অফিসার" হয়েছিল তারা মূলতঃ এসেছিল গ্রামীণ ভূ-স্বামী শ্রেণী থেকে, অবশ্য পুরোপুরি ভূ-স্বামী অভিজাত শ্রেণীটি থেকে নয়। শহরের শিক্ষিত

শ্রেণীটিকে সেনাবাহিনীর পদের উপযুক্ত মনে করা হোত না। বস্তুতঃ এটা "মন" ও "দেহ"-কে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার একধরনের বর্ণবাদী নীতিই, যেখানে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে কেরাণীসুলভ কাজকর্মে এবং গ্রামীণ ভূ-স্বামী শ্রেণীটিকে ভালো সৈনিক হিসেবে মনে করা হোত। ১৯৩০ সালের দিকে ব্রিটিশ সরকারের চিন্তাধারা ছিল নিম্নরূপ :

"একটু ব্যাপকভাবে বললে এটাই বলা যায় যেসব জাতি সবচেয়ে ভালো সেপাই সরবরাহ করেছে তারা মানসিক গুণে ভালো নয়। ভারতীয় একজন বুদ্ধিজীবীর সেনাবাহিনীতে ঢোকার কোনোই ইচ্ছে দেখা যায় না ···সামরিক জাতিগুলির গৌরবদীপ্ত যুবকেরা সেনাবাহিনীর জন্যে যেরকম জঙ্গী কাঁচামাল হতে পেরেছে, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় ও এলাকা সেনাবাহিনীতে তেমন একজন ব্যক্তিকেও সরবরাহ করেনি।"[১৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আয়তন বাড়ানো হয়। যুদ্ধ-প্রযুক্তির উন্নতি ও ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির কারণে সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার জন্য এই বর্ধিত সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য ব্রিটিশ বা ভারতীয় অফিসার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। ভারতের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ব্রিটিশরা আর নতুন করে এই চাকুরীতে যোগ দিতে তেমন আগ্রহী ছিল না, আর ভারতীয়রাও তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কামানের গোলা হতে তেমন ইচ্ছুক রইল না। এসব কারণে, ব্রিটিশ সরকার, তাদের কাছে রাজনৈতিকভাবে যারা গ্রহণযোগ্য, সেনাবাহিনীতে তাদের নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষাগত মান কমাতে বাধ্য হোল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ জাতীয়তাবাদ দ্বারা এত উত্তপ্ত ছিল যে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতীয়রা একটা দ্বৈত আনুগত্যের দ্বন্দ্বে ভুগত। এই দ্বন্দ্ব নিরসনে সেনাবাহিনীর ভারতীয় অংশের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল, হয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, নয়তো আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী হিসেবে তাদের সনাতন পেশাদারী ভূমিকাকে পুরোপুরি মেনে চলা। সেনাবাহিনীর রক্ষণশীল ঐতিহ্যের কারণে তারা আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী হিসেবে তাদের সনাতন ভূমিকাটাই বেছে নিল, যে ভূমিকায় ব্রিটিশ সরকার যেভাবে শিখিয়েছে সেভাবেই "কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা" ব্যাপারটি গুরুত্ব পেয়েছে।

১৯৩৯ সালের ১লা অক্টোবর ভারতীয় বাহিনীতে অফিসার ছিল ৩৯৬। এর মধ্যে ব্রিটিশ ছিল ৪,০২৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে একটা "স্বল্পমেয়াদী কমিশন" সৃষ্টি করা হলো যার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় অফিসারদের সংখ্যা ৮,৫০০ ও ব্রিটিশ অফিসারদের সংখ্যা ১৩, ৫০০ হোল। অবশ্য এই "স্বল্পমেয়াদী কমিশন"-প্রাপ্ত অনেক অফিসারই যুদ্ধশেষে বেসামরিক জীবনে ফিরে গেল। তাদের ফিরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে অফিসারের সংখ্যা দাঁড়াল ২,৬০০।[১৬]

স্বাধীনতার পরে : মধ্যবর্তী পর্যায়টি

স্বাধীনতার সময় সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অফিসারই ছিল হয় ব্রিটিশ কিংবা অ-মুসলমান। ফলে তাদেরকে পাকিস্তানে পাওয়া গেল না। এক সূত্র অনুযায়ী ক্যাপ্টেন বা তার উর্ধ্বে মাত্র ১০০ জন মুসলমান অফিসার পাকিস্তানের পক্ষে সার্ভিস বেছে নিয়েছিল এবং এদের কারোরই পদমর্যাদা কর্ণেলের উপরে ছিল না।[১৭] আরেক সূত্র অনুযায়ী "স্বাধীনতার সময় ১০০ থেকে ২০০ জন ভালোভাবে প্রশিক্ষিত পাকিস্তানী অফিসার ছিল।"[১৮] এইসব পাকিস্তানী অফিসারদের সঙ্গে ছিল "প্রায় ৫০০ ব্রিটিশ অফিসার" যারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরটিতে অধিষ্ঠিত হোল।[১৯] ভূ-স্বামী শ্রেণী থেকে আগত এইসব অফিসাররা কখনো কখনো সামন্তবাদী ও তাদের পেশাগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে ভুগলেও, পাকিস্তান সেনাবাহিনী মূলতঃ বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার চাইতে আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়ে যায়। এই ধারাটি ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতিরই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, যে নীতি অনুযায়ী "আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনে, বছরে বহুবার সেনাবাহিনীকে লাগানো হয়েছে…ভারতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উভয়ই, এমনকি যেটা বেশী উল্লেখযোগ্য যে জনগণও জানে, যে সেনাবাহিনীকে কখন পাঠানো হতে পারে।"[২০]

১৯৪৭ সালের ১লা জুলাই ব্রিটিশ সরকার ঠিক করে যে ১৫ আগস্টের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের তার নিজ নিজ সেনাবাহিনীর উপর চলাচল বিষয়ক (operational) নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণটা রইবে "সুপ্রীম কমাণ্ড"-এর হাতে যদ্দিন না উভয় সরকার তাদের নিজ-নিজ সেনাবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার মত অবস্থায়

না পৌঁছে। এই সুপ্রীম কমাণ্ডের প্রধান ছিলেন কিন্তু মার্শাল অচিনলেক যিনি পরে যথাক্রমে জেনারেল লকহার্ট ও জেনারেল গ্রেসিকে ভারত ও পাকিস্তানের কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে নিয়োগ করেন।[২১] এছাড়াও ওই সুপ্রীম কমাণ্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে ৫০০ ব্রিটিশ অফিসার ঢোকানো সম্ভব হোল যাদের মধ্যে কমপক্ষে ৪৮০ জন ১৯৫১ সালে প্রথম পাকিস্তানী জেনারেল আইয়ুব খান কমাণ্ডার-ইন-চীফ হওয়ার সময়ও সার্ভিসে ছিল।

এই "সুপ্রীম কম্যাণ্ড" ছাড়াও একটা "যৌথ প্রতিরক্ষা কাউন্সিল" গঠন করা হয় যার মূল কাজ ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়া।

"আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা" রক্ষায় তাদের ভূমিকার বিষয়টি ছাড়াও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর ধারা অনুযায়ীই, সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত হতে থাকে। ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্ট ও ভারতের দেরাদুনের মতই পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী ও পরে বিমানবাহিনী একাডেমী গড়ে তোলা হয়। স্বল্প পরিমাণ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়াও ভূ-স্বামী শ্রেণী থেকে নতুন সেনাবাহিনীর অফিসারদের গ্রহণ করা হতে থাকে। ওইসব একাডেমী থেকে প্রশিক্ষিত এসব "জেন্টেলম্যান ক্যাডেট", "জেন্টেলম্যান অফিসার" হিসেবে গণ্য হোত এবং তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টেও এই মর্যাদা প্রদান করা হোত। এইসব ক্যান্টনমেন্টগুলো ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যেই তৈরী করা হয়েছিল এবং অবস্থানগতভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে এগুলো দেশের বেসামরিক জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আলাভীর মতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব "তাদের পেশাগত চরিত্র ও ভূমিকা বৃদ্ধি করেছে" এবং তাদের মাঝে "যে সমাজে তারা বাস করছে তার একটা অংশ এবং আবার তা নয়ও" এরকম একটা মানসিকতা জন্ম দিয়েছে। সমাজ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গীর এই দ্বৈততার কারণেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গীর একটা দ্বৈততা সৃষ্টি হয়েছে।[২২] স্বাধীনতার পর পরই সেনাবাহিনী তার নিজের পুনর্গঠনে ব্যস্ত ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত তার বেতন ও সুযোগ-সুবিধা ভালোভাবে মিটে আসছিল ততদিন পর্যন্ত ভূ-স্বামী ও আমলা-তন্ত্রের এলিটদের দ্বারা পরিচালিত রক্ষণশীল সরকারসমূহের নীতির বিরোধিতার কোনো কারণ তার ছিল না। অবশ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক কারণ,

যেমন স্বাধীনতার সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসমূহ, ১৯৪৮ সালের প্রথম কাশ্মীর সংঘর্ষে সরে থাকা এবং খালের পানি ও দেশত্যাগীদের সম্পত্তির প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে অচলাবস্থা, ইত্যাদির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা প্রচন্ড "ভারত-বিরোধী জাতীয়তাবাদ"-এর সৃষ্টি হয়।[২৩]

কিছুটা সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার পর পাকিস্তান তার অবস্থার একটা মূল্যায়ন করে এবং এর শাসকরা ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মিত্র খুঁজে বের করার কথা চিন্তা করে।[২৪] বন্ধু খোঁজার এই প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করতে যান এবং ওয়াশিংটন ডি.সি-র জাতীয় প্রেস ক্লাবে ভাষণে বলেন, "সংঘাতময় মতাদর্শের এই জগতে, এটা স্বাভাবিক যেসব দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে তারা মানসিক বিভ্রান্তি ও এর ফলশ্রুতিতে অস্থিতিশীলতায় ভুগবে। তাই এটা খুবই সন্তোষের বিষয় যে অনেক জাতির মধ্যে অন্ততঃ একটা জাতি সেই বিভ্রান্তিতে ভুগছে না এবং তার ঐতিহ্য ও বিশ্বাস অনুযায়ী একটা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের নীতি গ্রহণ করেছে।"[২৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে সাযুজ্যতা খুঁজতে গিয়ে লিয়াকত আলী খান পুঁজিবাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে এটাই হচ্ছে "শুধুমাত্র আমাদের দেশের নয়, দুনিয়ার সর্বত্রই অর্থনৈতিক সমতা অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।"[২৬] তিনি মার্কিন বিনিয়োগকারীদের পাকিস্তানে পুঁজিবিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, "দেশীয় অধীনে কিছু কিছু শিল্পে ৫১% পর্যন্ত এবং অন্যান্যগুলিতে ৩০% পর্যন্ত বিদেশী পুঁজির অংশগ্রহণকে আমরা স্বাগত জানাই।"[২৭]

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেবা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁর ভাষায়, "আমরা জানি যে আগ্রাসন প্রতিহত করতে আপনারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ... এই কাজে আপনারা আপনাদের মিত্রহিসাবে পাকিস্তানকে পাবেন।" কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে সংঘাতটা বিবেচনায় ছিল বলে লিয়াকত আলী খান পরিষ্কার করে বল্লেন যে তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী আগ্রাসন বলতে শুধুমাত্র "কমিউনিস্ট আগ্রাসন" নয়, সাধারণভাবে আগ্রাসন বোঝায়। তাই তিনি আশা প্রকাশ করেন যে যুক্তরাষ্ট্র "এক আগ্রাসন থেকে আরেক আগ্রাসনকে পৃথক করে" দেখবে না।[২] এই বক্তব্য নিশ্চয়ই মার্কিন কর্তা-

ব্যক্তিদের পছন্দ হয়েছিল যাদের কাছে "ভারতীয়, ইরানীয় ও ইন্দোনেশীয়দের কাজকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গী সহজবোধ্য হচ্ছিল না।"[২৯]

"কোনো বড়ো শক্তি বা শক্তিসমূহের ক্ষেত্রে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি"-র তুলনায় পাকিস্তানের এই দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির বেশী অনুকূলে ছিল।[৩০]

১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান নিহত হবার পর পাকিস্তানের প্রশাসনিক ও কার্যকর ক্ষমতা বেসামরিক উচ্চপদস্থ আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যায়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদটি যায় ব্রিটিশ(ভারতীয়)অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসের একজন সিনিয়র অফিসার গোলাম মোহাম্মদের কাছে এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা যায় স্যাণ্ডহার্স্ট মিলিটারী কলেজের গ্রাজুয়েট (ব্রিটিশ) ভারতীয় পলিটিক্যাল সার্ভিসের সদস্য) ইস্কান্দর মীর্জার কাছে যিনি একসময় পাকিস্তানের প্রথম প্রতিরক্ষা সচিব ও পরে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন। ক্ষমতার সিঁড়িতে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন আরেকজন স্যাণ্ডহার্স্ট গ্রাজুয়েট ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রথম কমাণ্ডার-ইন চীফ জেনারেল আইয়ুব খান। ক্ষমতার এই পরিবর্তনের পর সামরিক সাহায্যের জন্যে পাকিস্তান প্রথম ১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেয়ার্সের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তবে ১৯৫২ সালের আগে পর্যন্ত পাকিস্তান "স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহানুভূতি অর্জনে ব্যর্থ হয়"। পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে একটা মোড় পরিবর্তন ঘটে যখন ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে হেনরী বাইরোডকে দূর প্রাচ্য-দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের সহকারী সচিব নিয়োগ করা হোল। বাইরোড তার সামরিক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে ইস্তফা দিয়ে এই পদ গ্রহণ করেন। এই সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে বাইরোডের "কোনো বাস্তব জ্ঞান ছিল না" এবং তার "উপরওয়ালাদের কাছ থেকেও কোনো নির্দেশিকা" তিনি পাননি। বাইরোড ব্যাপকভাবে স্যার ওলেফ ক্যারোর থীসিসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং ১৯৫২ সালে ক্যারো ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে এলে তার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন।[৩২] স্টেট ডিপার্টমেন্টে বাইরোডের নিয়োগের ফলে পাকিস্তান ও পেন্টাগনের সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে যোগাযোগের পথ সুগম হয়। ফলে ১৯৫২ সালে দুই দেশের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সমঝোতা হয় যার ফলে "শুধুমাত্র একটা কর্মসূচী গ্রহণ নয়, পাকিস্তান একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন কর্মসূচীতে যা যা চায়", সে ব্যাপারেও ঐকমত্য হয়।[৩৩]

আইসেনহাওয়ার প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী আরো কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান, যে দেশটি ১৯৫১ সালেই তার কমিউনিস্ট-বিরোধী অবস্থান ব্যক্ত করেছিল, সঙ্গত কারণেই দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগের অন্যতম প্রধান দেশে পরিণত হোল। ১৯৫৩ সালের মে মাসে জন ফস্টার ডালেস পাকিস্তান সফরে এলেন এবং ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে হাউজ আর্মড সার্ভিসেস কমিটির সাত-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল এবং তুরস্কে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের ডেপুটি প্রধান পাকিস্তান সফর করলেন।[৩৪] ইতিমধ্যে পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররাও বহু সফর বিনিময় করেছে। প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দর মীর্জা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান তুরস্কে ("ন্যাটো"ভুক্ত দেশ) সফর করেন এবং ওখান থেকে সামরিক ক্ষেত্রগুলো দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।[৩৫]

পেন্টাগন ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা যখন ১৯৫২ সালের "স্বল্প মাত্রার কর্মসূচীকে আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনারত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রচার মাধ্যমগুলি পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষাচুক্তি করলে যুক্তরাষ্ট্রের কী কী লাভ হবে তা ফলাও করে প্রচার করা শুরু করে এবং এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাকে খাটো করে দেখায়। প্রচার-মাধ্যমগুলি এই প্রথম আবিষ্কার করে বসে যে "কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি-র ভারতের একটা ইতিহাস রয়েছে এবং জাতিসংঘে এর প্রতিনিধিরা রুশ প্রতিনিধিদের "পক্ষে থাকে"।[৩৬] প্রচার-মাধ্যম ছাড়াও কমিউনিজমকে প্রতিহত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান চুক্তির পক্ষে মার্কিন সিনেটও ব্যাপকভাবে সমর্থন জানায়। উদাহরণস্বরূপ সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা সিনেটর নোল্যাণ্ড ১৯৫৩ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক ব্যক্তিগত সফর শেষ করে এসে বললেন যে, "কমিউনিজমের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তুরস্কের মতই সম্ভাবনা রয়েছে এবং পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সুনির্দিষ্ট মিত্র হতে পারে।" ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির কারণে রুষ্ট হয়ে ১৯৫৩ সালে তিনি বলেন যে ভারতকে এশিয়ার মুখপাত্র বলা চলে না কারণ ঔই অঞ্চলে ব্যাপক মতাদর্শগত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্য রয়েছে।[৩৭] ফলে ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র "নিরপেক্ষ" ভারতের প্রতিবেশী এক দৃঢ় ও প্রস্তুত মিত্রকে "পেয়ে গেল"। মার্কিন জনগণের কাছে পাকিস্তানকে এইভাবে চিহ্নিত করা হলো,

দেশটির ৩00,000 সৈন্যবাহিনী রয়েছে।... এটি নিরপেক্ষ নয়, কমিউনিস্ট বিরোধী। ..এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক স্ট্রাটেজীতে একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে। সে ফাঁকটা হচ্ছে তুরস্ক থেকে পূর্বভারত পর্যন্ত। সেদিক থেকে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মিত্র হতে পারে।"

ভারতের ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্নতা যে পাকিস্তানকে সরবরাহকৃত মার্কিন সামরিক সাহায্য তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, আরব দেশসমূহের ক্রমাগত উদ্বেগ যে এই সাহায্য যুক্তরাষ্ট্র-মধ্যপ্রাচ্য-পাকিস্তান সমপর্কে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে এবং ওয়াশিংটন ডি.সি-তে সফররত ভারতীয় প্রতিনিধির প্রতি আইসেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত আশ্বাস প্রদান যে "করাচীর সঙ্গে সামরিক মৈত্রীর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক" রইবে, সত্ত্বেও, ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে এটা প্রকাশ পেল যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করতে সম্মতি জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে এই চুক্তির অর্থ ছিল "একটি বন্ধু সেনাবাহিনীর ১৩ ডিভিশন সৈন্য লাভ ও সে সময়ের জন্যে "সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচে কাছে" কিছু ঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ। [৯]

অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদানের ঘোষণাটি দেয়া হোল। এই সিদ্ধান্তের মাত্র কয়েকজন সমালোচনাকারীর অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির উইলিয়াম জে ফুলব্রাইট ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতির আলোকে এই চুক্তিকে একটি "দুর্ভাগ্যজনক ভুল"[৪০] বলে বর্ণনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় করাচীতে ১৯৫৪ সালের ১৯শে মে তারিখে। এ ছাড়া পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি" (১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর) ও "বাগদাদ চুক্তি"তে (পরে সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা "সেন্টো" নামে পরিচিত) ১৯৫৫ সালের শুরুর দিকে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আরো অসংখ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা সামাজিক কাঠামোর প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় আরোহন

যদিও ১৯৫৪ সালে সামরিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় তবুও ১৯৫৬ সালের আগে পাকিস্তানে কোনো বড় আকারের সামরিক সরঞ্জাম এসে পৌঁছয়নি। ১৯৫৬

সাল থেকে অবশ্য "মিলিটারী এসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম" (MAP) অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধান সামরিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ সরবরাহকারীতে পরিণত হয়।[৪১] অনেক সময়ই পাকিস্তানকে সবচে "বিশ্বস্ত মিত্র" এবং অন্যদের বিরক্তিভাজন করে আখ্যায়িত করা হয়েছে এশিয়ার অন্যতম "পোষ্য রাষ্ট্র" হিসেবে। ১৯৬১ সালে মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এই ধারণাটাকে আরো তুলে ধরলেন এই বক্তব্যে যে, এই মহাদেশে পাকিস্তানই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে মার্কিন সেনাবাহিনী "মুক্ত-বিশ্ব"-কে রক্ষা করার জন্যে যখন খুশী অবতরণ করতে পারে।[৪২] তবে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর মার্কিন সামরিক সাহায্য পাকিস্তানে কমিয়ে দেয়া হয় এবং ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পর তা বন্ধ করে দেয়া হয় (অন্ততঃ সরকারীভাবে)। তবে সামরিক চুক্তিসমূহের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর উন্নত সামরিক প্রযুক্তি এবং দেশের বাজেটের এক সিংহভাগ (৫.১ সারণি দেখুন) পেতে থাকার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশের বেসামরিক সরকারে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালে যখন উচ্চদস্থ বেসামরিক আমলারা রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্যকরভাবে দখল করে, তখনই জেনারেলরা রাজনীতিতে খোলামেলাভাবে ঢুকে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে। যেমন একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন যে, "এই বিষয়টি বেশ প্রতীকধর্মী যে একই সময় যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হোল তা হচ্ছে জাতীয় সরকার বাতিল, জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া এবং নতুম মন্ত্রীসভায় সেনাবাহিনীর একজন সদস্যকে মন্ত্রী বানানো।"[৪৩] এই নতুন মন্ত্রীটি ছিলেন অন্য কেউ নন স্বয়ং আইয়ুব খান, যিনি ১৯৫১ সালে একটি "শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত বন্ধু"-র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই) কথা ভেবেছেন এবং যিনি অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সহযোগিতায় ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশকে নস্যাৎ করলেন এবং ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু রাখলেন।

পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণটি এতদিন গোপন রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র এখন খোলাখুলিই পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যের পরিমাণের কথাটা বলছে, যে পরিমাণকে জেনারেল জিয়াউল হক অবশ্য খুবই "যৎসামান্য" বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতীতে প্রতিটি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত সামরিক সাহায্যকে আলাদা আলাদা করে দেখানো হোত। পাকিস্তান ছিল এক-

সারণি ৫.২

১৯৪৬-৬০ ও ১৯৬২-৬৯ (মিলিয়ন ডলার হিসেবে) নিকটপ্রাচ্য ও এশীয় অঞ্চলের চিহ্নিত দেশসমূহে প্রদত্ত সামরিক সাহায্য

বছর*	নিকটপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিতরণ	যেসব দেশ ২নং শিরোনাম অনুযায়ী পেয়েছে
১৯৪৬-১৯৬০	৫৭৪.০০০	পাকিস্তান, সৌদী আরব
১৯৬২	৫৫.৩৮০	পাকিস্তান, সৌদী আরব
১৯৬৩	৫২.১০০	পাকিস্তান, সৌদী আরব
১৯৬৪	৯৪.৪০০	পাকিস্তান, ভারত, নেপাল
১৯৬৫	৮৭.৭৮১	পাকিস্তান, ভারত, নেপাল
১৯৬৬	১১.৯০৮	পাকিস্তান, ভারত, নেপাল
১৯৬৭	—	— — —
১৯৬৮	—	— — —
১৯৬৯	.১৭১	পাকিস্তান (.০৮৮ মার্কিন ডলার) ভারত (.০৫৩ মার্কিন ডলার) নেপাল (.০৩০ মার্কিন ডলার)
মোট	৮৭৫.৭৪০	— — —

উৎস : ১৯৪৬-১৯৬০ সালের পরিসংখ্যান আলাভী ও খসরুর কাছ থেকে নেয়া। ১৯৬২-৬৯ সালের পরিসংখ্যান কংগ্রেসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ১৯৬২ ও ১৯৬৩-১৯৬৭ সালের রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

*১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

"পুরনো ও বাতিল সামরিক যন্ত্রপাতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষেত্রে ... সামরিক সাহায্য কর্মসূচী ভালো কাজ দিয়েছে। বিমানবাহিনী যখন বি-৫৭ জেট বোমারু বিমান বাতিল করার জন্য সামরিক তহবিল পেল, তখন সে তা আরো নতুন মডেলের বিমানের জন্যে ব্যয় করতে পারল। ফলে পাকিস্তানকে সাম্প্রতিক কালে (১৯৫৯ সালে) প্রদত্ত ৮টি বি-৫৭ বিমান দেয়ার (এবং এরকম আরো কিছু বিমানের প্রতিশ্রুতি দেয়া) ফলে বিমান বাহিনী নীট ৭ মিলিয়ন ডলার মুনাফা করে। বি-৫৭ বিমান দেয়া যেতে পারল কারণ বিমান বাহিনী সদর অফিস এর ১৮টি বিভাগ কমিয়ে ৯টিতে নামিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।"[৪৭]

সারণি ৫.৩

পাকিস্তান যেসব অস্ত্র পেয়েছে পাওয়ার উৎস, ১৯৬৫

অস্ত্র	সংখ্যা	উৎস
৯এমএম স্টেন সাবমেশিন গান	—	গ্রেট বৃটেন
.৩০৩ ব্রেন লাইট মেশিন গান	—	,,
৭.৬৮ ম্যাডসেন মেশিন গান	—	ডেনমার্ক/জার্মানী
.৫০ ক্যাল, ব্রাউনিং মেশিন গান	—	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৮৩এমএম রকেট লঞ্চার	—	—
৬০এমএম মর্টার	—	—
৮১এমএম মর্টার	—	—
১২৫এমএম আর্টিলারী)		মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
১৫০এমএম আর্টিলারী)	৯০০	
১৭এমএম আর্টিলারী)		
২০এমএম ওরলিকন ক্যানন		
মাউন্টেড অন উইপন্স ক্যারিয়ার	—	
৯০এমএম এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্ট উইপেন	—	
১১৫এমএম সেল্ফ-প্রপেল্ড গান্স	—	
এম-৪ শেরম্যান ট্যাঙ্ক	প্রায় ২০০	
এম-২৪ শাফি লাইট ট্যাঙ্ক	প্রায় ৫০	
এম-৪১ বুলডগ লাইট ট্যাঙ্ক	প্রায় ৫০	
এম-৪৭ ও এম-৪৮ প্যাটন ট্যাঙ্ক	প্রায় ৪০০	
টি-৩৩ জেট ট্রেনার	কমপক্ষে ৬টি	
টি-৩৭ জেট ট্রেনার	কমপক্ষে ২২টি	
মার্টিন বি-৫৭ বোম্বার (ক্যানবেরা)	৩০	,,
ক্যানবেরা বোম্বার	৫০	গ্রেট বৃটেন
এফ-৮৬ স্যাবরজেট	১০০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
এফ-১০৪ স্টারফাইটার	৫০	,,
লাইট ক্রুজার	১	গ্রেট বৃটেন
ডেস্ট্রয়ার	৮	
ফ্রিগেট	৩	,,
কোস্টাল মাইনসুইপার	৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
পেট্রোল ক্রাফ্ট	৪	গ্রেট বৃটেন
সাবমেরিন	১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

উৎস: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ এজেন্সী, ১৯৬৭:৩২৯-৩০।

সারণি ৫·১

পাকিস্তানের অর্থনীতিতে সামরিক খাতে ব্যয়

বছর	সামরিক খাতে ব্যয় (মার্কিন ডলারে)	মাথা পিছু মার্কিন ডলার	মোট সরকারী ব্যয়ের %	মোট জাতীয় উৎপাদনের %
১৯৪৭-৪৮	৩২·৪	—	৫০	—
১৯৫০	১৩৬·৮	—	৫১	—
১৯৬১	২৩৪·২	—	৫৮·৭	৩·১
১৯৬৬*	৬০১·১	—	৬৩·৫	৫·৩
১৯৬৯	৫৪৫·০	৪	৫৫·৬	৩·৪
১৯৭০	৬২৬·০	৫	৫৩·৪	৫·৩
১৯৭১*	৭১৪·০	১৪	৫৫·৭	৬·৯
১৯৭২	৪০৬·০	৮	৫৯·১	৭·২
১৯৭৩	৪৭১·০	৮	৫৮·১	৫·৬
১৯৭৪	৫৭৫·০	৬	৫১·০	৮·৪
১৯৭৫	৭২৫·০	১০	—	৭·২
১৯৭৬	৮০৬·০	১১	—	৫·৫
১৯৭৭	৯৬০·০	১৩	—	৬·৩
১৯৭৮	১,০৫০·০	১৪	—	৫·৭
১৯৭৯	১,১৮৬·০	১৫	—	৫·৯

উৎস : "দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ", "দি মিলিটারী ব্যালান্স", ১৯৬৫-১৯৭৯/৮০, লণ্ডন, ১৯৬৬-৮০ এবং হাসান আসকারী রিজভী, "দি মিলিটারী এণ্ড পলিটিক্স ইন পাকিস্তান" লাহোর, ফিসকো প্রেস, ১৯৭৪।

*ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের বা তার পরের বছর।

মাত্র ব্যতিক্রম। পাকিস্তানকে প্রদত্ত সাহায্য "নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল"-এ প্রদত্ত এই শিরোনামে প্রকাশ করা হোত। পাকিস্তান ও সৌদী আরবের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সামরিক সাহায্যকে "গোপন (classified) দলিল" হিসেবে চিহ্নিত এবং তা "নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিতরণ" এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। তবে এটা সহজেই দেখা যায় যে পাকিস্তানের সামরিক শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। সারণি ৫·২ থেকে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৪৭-৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে "নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিতরণ"-এর জন্য

শিরোনামে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও নেপালকে প্রদত্ত ৪৭৫.৭৪০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের মধ্যে ৬৮১.৪৮০ মিলিয়ন ডলার বা ৭৭.৮%-ই গেছে শুধুমাত্র সউদী আরব ও পাকিস্তানে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র তার "কমিউনিজম ঠেকানো"-র বৈশ্চিক স্ট্রাটেজিতে ভারতকেও পাবার আশায় ভারতের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে ও তাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে।

হ্যারিসন হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ১৯৫৯ সালের শেষ নাগাদ পাকিস্তানকে প্রদত্ত সামরিক সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে ৫২২ মিলিয়ন ডলার।[৪৪]

পাকিস্তান কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য পেয়েছে তা আরো স্বচ্ছভাবে বোঝার জন্যে "অস্ত্র-সাহায্যের একটা বিশ্লেষণ" করা যেতে পারে। ৫·৩ নং সারণিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান কোন্ দেশ থেকে কী কী অস্ত্র পেয়েছে তা তুলে ধরা হোল।

এটা পরিষ্কার যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর "আধুনিকীকরণ"-এর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মূলতঃ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, যদিও গ্রেট বৃটেনের ভূমিকাও বেশ ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে (সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত) পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক সাহায্য, অন্ততঃ "সরকারীভাবে" যখন বন্ধ থাকে, এ সময়টা পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী চীন থেকে সামরিক সরবরাহ পেয়ে এসেছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের তুলনায় এর পরিমাণ ছিল খুবই কম। চীনের সরবরাহ পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্রের উপর, বিশেষ করে খুচরা-যন্ত্রপাতি ও গোলা-বারুদের ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি।[৪৫] পাকিস্তানের একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের মতে দেশটির "বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে" যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত সাহায্যের একটা "গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব"[৪৬] রয়ে গেছে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরেই পাকিস্তানে অস্ত্র-সরবরাহের একটা মূল উৎস হিসেবে কাজ করে এসেছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে পাকিস্তান ও অন্যান্য এসব "মিত্র" দেশগুলোকে অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারটি অনেকখানিই ছিল পুরনো জঞ্জাল বিক্রীর একটা বাজার। "দি সেন্ট লুই পোস্ট ডেসপ্যাচ" পত্রিকার সামরিক বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস আর. ফিলিপস্-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হ্যারিসন বলছেন,

তবে এই বিশেষ সময়কালটাতে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থাটা বিবেচনায় রাখলে এই কথা ধোপে টেকে না। এই সামরিক অভ্যুত্থানের পশ্চাৎভূমিতে রয়েছে ইরানের মোসাদ্দেকের ঘটনা, ইরাকে সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতন ও বাগদাদ চুক্তি নস্যাৎ হওয়া এবং পাকিস্তানের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ও বিশেষ করে যখন পশ্চিমা দেশসমূহের সঙ্গে এরকম সামরিক গাঁটছড়ার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এসবই এমন ঘটনা যা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক স্বার্থের পরিপন্থী। এর পরে পাকিস্তানে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দুর্বল হোত।[৫৫] তাই রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আইয়ুব খান আনীত কিছু অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার না করেও বলা যায় যে সামরিক অভ্যুত্থানটার মূল কারণ ছিল এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের তেল-স্বার্থ এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর নব-অর্জিত সুযোগ-সুবিধাসমূহ রক্ষা করা।

একবার ক্ষমতায় আসার পর, দুর্নীতিবাজ কিছু আমলার বিরুদ্ধে লোক-দেখানো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরই সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে এক-যোগে মিলে রাজনীতিবিদদেরকে হেয় ও নস্যাৎ করার কাজে উঠে-পড়ে লাগে।[৫৬]

যেসব পদ্ধতির কারণে আইয়ুব সরকারের রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখানে করছি না। সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে পাকিস্তানের মত কৃষিভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত একটা রাষ্ট্রের কাঠামোগত সমস্যা শুধুমাত্র কিছু মলম লাগিয়ে সাময়িকভাবে প্রলেপ লাগানো গেলেও তা মূলতঃ সঙ্কটকে আরো দীর্ঘস্থায়ীই করে। দেশের প্রায় সবক্ষেত্রেই মার্কিন উপদেষ্টা নিয়োগের ফলে ষাট দশকের শুরু থেকেই অর্থনীতি ও সামরিক বাহিনীর উপর যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকরী প্রভাব নিরঙ্কুশ হয়।[৫৭] একটা উদাহরণ হচ্ছে পেশোয়ারের ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে ইউ-টু বিমানের যাতায়াত (এবং গ্যারি পাওয়ারের বিমানটির সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ভূ-পাতিত করার পর জনসমক্ষে তা প্রকাশ হয়ে পড়া)। এইসব ঘটনা জনগণের অনুভূতিকে আঘাত করে এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন ও পশ্চিমা শক্তিসমূহের সঙ্গে মিত্রতার নীতি প্রশ্নে জনগণ উদ্বিগ্ন হয়।

পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বল্পকালীন হানিমুন যাপন করার পর ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি খুব বেশী ঝুঁকে পড়ে।

এর ফলে পাকিস্তানের নেতারাও কিছুটা ভিন্নসুরে কথা বলতে শুরু করেন। যেমন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (মোহাম্মদ আলী) জাতীয় পরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, "পাকিস্তান কোন বিশেষ শক্তির বশংবদ হবে না" এবং "চীনের সঙ্গে ঘনিষ্টতম সম্পর্ক গড়ে তুলবে।"[৫৮]

১৯৬২ সালের ১৩ই অক্টোবর পিকিং-য়ে পাকিস্তানে অধিকৃত পশ্চিম কাশ্মীর ও চীনের সিনকিয়াং প্রদেশের সীমান্ত নির্ধারণ সম্পর্কিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে একটা সম্ভাব্য মৈত্রি-চুক্তির আভাস তোলা হয়। এই সামান্য ঘটনাটিতেই যুক্তরাষ্ট্রের মনে পাকিস্তানের "কমিউনিষ্ট বিরোধী" মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কোনো মিত্রদেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেয়েও যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজম প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষাটাই যে বেশী তীব্র তা আমরা মূর্ত হতে দেখি যখন দেখি যে ওয়ালটার ম্যাককনোগী (পাকিস্তানের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত) পাকিস্তানের কাছে, "চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ভারত সীমান্তে নীরব থাকার"[৫৯] দাবী জানাচ্ছেন। চীনের বিরুদ্ধে পাক-ভারত একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার পশ্চিমা আশা বস্তুতঃ চীন-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরের পর উবে যায়। এই ঘটনার কারণে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-এশিয়ায় তার নীতি পুনর্বিবেচনা করে এবং ভারতকে প্রচুর সামরিক সাহায্য প্রদান করে যার ফলে কাশ্মীরে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হয়।[৬০]

১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে নাসাউতে অনুষ্ঠিত ম্যাকমিলন-কেনেডী বৈঠকে প্রথম ভারতকে অস্ত্র-সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে ঐকমত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ভারতকে ১২০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক উপকরণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে মূল সামরিক সাহায্যটা ভারত পায় ১৯৬৪ সালের মে মাসে যখন ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্র আগামী পাঁচ বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী ও ব্রিটেন আরো ৫০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র-সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের ক্ষেত্রে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৬৪ সালে এক মার্কিন পর্যবেক্ষক বলেন যে,

"কমিউনিজমকে ঠেকানোর জন্য জন ফস্টার ডালেস মিত্রদেশসমূহ নিয়ে যে বেষ্টনী গড়তে চেয়েছিলেন, এর ফলে, তার সবচেয়ে বড় ফাঁক ভারতের ফাঁকটি পূরা হ'লো। হয়তো এটা একটা ভাল জিনিস। ভারতের জন্য তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এর ফলাফল হয়তো সবটাই ভাল হবে না।

এতসব সাহায্য প্রদান সত্ত্বেও, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের কিছু পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার ছিল। এই কারণে (আজাদ) কাশ্মীর ও পূর্ব-পাকিস্তানে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে এই সাহায্যের আওতার বাইরে রাখা হয়। এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-এশিয়ার সার্বিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মাথাব্যথা হচ্ছে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে তেলের সরবরাহ সুনিশ্চিত রাখা। আর সেটা করা সম্ভব যদি এই অঞ্চলে উন্নত যুদ্ধ-প্রযুক্তি স্থাপন করা যায়।[৪৮] স্বাভাবিক ভাবেই কাশ্মীর ও পূর্ব-পাকিস্তানের এই লক্ষ্যে কোনো স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব ছিল না। তাছাড়া কাশ্মীর যেহেতু দীর্ঘকাল ধরেই ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের একটা উৎস, তাই কাশ্মীরে নিয়োজিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে আরো সুসজ্জিত করে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে সম্পর্ক তিক্ত করতে চায়নি, বিশেষ করে কেনেডী প্রশাসনের আমলে যখন আরো বেশী আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা নেয়া হচ্ছিল।[৪৯]

পাকিস্তানকে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য প্রদানের পর পাকিস্তানের এসব অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেওয়াও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে জরুরী হয়ে পড়ল। এই ট্রেনিংএর লক্ষ্য শুধুমাত্র কারিগরী ছিল না, তৃতীয় বিশ্বে সেনাবাহিনীর এলিটদের নিয়ামক ভূমিকার কারণে এই লক্ষ্যের একটা রাজনৈতিক দিকও ছিল। তাই দেখি যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই, "শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ সামরিক দক্ষতার চেয়েও আরো বেশী কিছুর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে।"[৫০] এই ট্রেনিং, তা' রাজনৈতিক ও সামরিক যেটাই হোক্ না কেন, মূলতঃ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য কর্মসূচী" বা সংক্ষেপে "MAP" এর অধীনে প্রদত্ত হয়েছে। ১৯৫০-৭১ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্যত্র, ৭০টি দেশের ৩০০,০০০ সামরিক অফিসার ও অন্যান্য পদমর্যাদায় ব্যক্তিদের "MAP" প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের "জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি" বিষয়ক সিনেট সাব-কমিটির কাছে "MAP" প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেন এবং এর লক্ষ্য হিসেবে বলেন যে,

"প্রথমতঃ, অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের ভেতরে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে ও তাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থ বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আরো বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা, আর

তা' হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগের কর্মসূচীর মাধ্যমে হাজার হাজার বিদেশী নেতা বা সম্ভাব্য নেতাকে মার্কিন জীবন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে পরিচিত করা।"[৫১]

শুধুমাত্র ১৯৬৮-৬৯ সালটি ছাড়া যে বছর ৬০ জন পাকিস্তানী অফিসার "MAP" কর্মসূচীর অধীনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রশিক্ষিত হয়েছিল, বিশেষ ভাবে গোপন রাখা হয়েছে বলে অন্যান্য বছরগুলোর, কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এই "MAP" প্রশিক্ষণ সম্পর্কে একজন উচ্চপদস্থ পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ১৯৬৩ সালে লেখেন যে, "মার্কিন কৃৎ-কৌশল ও মার্কিন যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্যে এই কর্মসূচীর অধীনে বহু কোর্স ও শিক্ষা-সফরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। . . . অফিসারদের উপর এইসব কোর্স, শিক্ষা-সফর ও সফরের একটা নিয়ামক প্রভাব পড়তে বাধ্য। এগুলো খুব দ্রুতই পাকিস্তানী কমাণ্ডার ও অফিসারদের চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। সেনাবাহিনীর গঠনের দিক থেকেও, মার্কিন চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনাকারীদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।"[৫২]

ফলে ১৯৫০-এর দশকের শেষ নাগাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনী। সংগঠনটি শুধুমাত্র কৃৎ-কৌশল ও বৈষয়িক দিক থেকে নয়, মতাদর্শগত দিক থেকেও বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেশটির মূল কাঠামোগত দ্বন্দ্বসমূহ যখন পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়, তখন আমলাতন্ত্রের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন দখল করে এবং পাকিস্তানে যেটুকু রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছিল, সেটুকুও ধ্বংস করে।

প্রথম সামরিক ক্যুর সম্পর্কে আইয়ুব খানের যুক্তিটা ছিল যে, এর দ্বারা "দুর্বল ও অক্ষম সরকার সমূহ যারা শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করেছে" এবং রাজনীতিবিদরা যারা "দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে বিরতিহীন ও তিক্ত এক ঝগড়া-ফ্যাসাদ করছিল", তাদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা।[৫৩] সামরিক অভ্যুত্থানকে "একটা পদ্ধতি হিসেবে" সমালোচনা করার পরও "দি নিউইয়র্ক টাইমস" ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর এক সম্পাদকীয়তে এই অভ্যুত্থানটার পক্ষে এই বলে সাফাই গায় যে,

"পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মীর্জা ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান এটা পরিষ্কার করে বলেছেন যে তাঁরা যেটা চান তা হচ্ছে উপযুক্ত সময়ে দেশে একটা চমৎকার সৎ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তাদের এই আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ নেই।"[৫৪]

...এই ফাঁকটা পূরণ করতে গিয়ে আমরা পাকিস্তানে একটা ফাঁক সৃষ্টি করলাম। ...পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল এখন ভারতের কাছে অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল।"[৬১]

যুক্তরাষ্ট্রের "সুবিধাবাদ" ও চীনের চারপাশে "ক্ষমতা জড় করার"-র কারণে এবং "আরেকটি কোরিয়া" সৃষ্টির ঝুঁকি নেয়ার কারণে আইউব খান সমালোচনা করলেও এবং ভারত মহাসাগরে মার্কিন ৭ম নৌবহরের টহল ও ভারতে অস্ত্র-সরবরাহের কারণে ভুট্টো কর্তৃক পাকিস্তানের "সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ" পুনর্বিবেচনার দাবী তোলা সত্ত্বেও তখনকার বাস্তব অবস্থায় এমন ছিল যে পাকিস্তান যদি আন্তরিকভাবে চেয়েও থাকে তবু তার পশ্চিমা মিত্রদের হাত থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। এ সময়কালটাতে পাকিস্তানের উভয় সঙ্কট সম্পর্কে ১৯৬৩ সালে ভারতের মার্কিন সাংবাদিক হাজেন বলেন যে,

"পাকিস্তান আজ তিক্ত, হতাশ ও প্রতিশোধপরায়ণ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দশ বছর ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও পাকিস্তান ভারতের শাসন থেকে মুসলিম কাশ্মীরকে ছাড়িয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারেনি। ...যতদিন আইয়ুব ক্ষমতায় রয়েছে ততদিন দেশটি পশ্চিমা শিবিরে রইবে এবং সে চলে যাওয়ার পরও আমি জানি না পাকিস্তান যে ভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়ে আসতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাতে পশ্চিমা দেশসমূহ ছাড়া সে আর কোন্‌দিকেই বা যেতে পারে।"[৬২]

মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে (১৯৬৫ সালের মধ্যে দেশটি ১.২ বিলিয়ন ডলার সামরিক ও ২.৬ বিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে) পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে নামল, যে দেশটিও যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত অস্ত্রে সজ্জিত। প্রাথমিক সংঘাতের পর পরাশক্তিরা যুদ্ধবিরতিতে এবং তাসখন্দে একটি শীর্ষবৈঠকে দেশ দু'টিকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়। প্রথমদিকে পাকিস্তান এই শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু তখন লিণ্ডন জনসনের কাছ থেকে আইয়ুব খান একটা নাটকীয় টেলিফোন কল পেলেন, "যাও, নতুবা... "।

যদিও ১৯৬৫ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে পাকিস্তান ও ভারতকে সামরিক সাহায্য প্রদানে বিরত থাকে, কিন্তু বাস্তবে ভারতীয় বা মার্কিন জনমতকে ক্ষুব্ধ না করেও পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের একটা কৌশল যুক্তরাষ্ট্র বের করে। এই কৌশল দ্বারা পাকিস্তান ইতালী, তুরস্ক, ইরান বা তৃতীয় কোনো

দেশ থেকে মার্কিন অস্ত্র কিনতে পারে। এর ফলে এক সূত্রের মতে, ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান ইরানের কাছ থেকে ৮০ টি এফ-৮৬ স্যাবর জেট কেনে যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের লাইসেন্স দ্বারা কানাডায় নির্মিত হয়েছিল।[৬৩]

দু'একটি বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্র ছাড়া ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সামরিক-আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রায় বিনা চ্যালেঞ্জেই পার হয়। এরপর বেশকিছু ঘটনার যোগফল, যেমন ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক অসাম্য, রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-দ্বন্দ্ব এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধ সাময়িকভাবে সামরিক শাসনের অবসান ঘটায়। ক্ষমতা নিয়ে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কামড়া-কামড়ি এত পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে শহরে-শিল্প শ্রমিক বা কৃষকদের আর আগেরমত বোকা বানানো সম্ভব হয় না। ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ সেইসব দলের প্রার্থীদেরই ভোট দেয় যেসব দলের আঞ্চলিক স্বাধিকার বা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ছিল। তকমাওয়ালারা পুরোপুরি উৎখাত হয়।[৬৪] জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে, যে জাতীয় পরিষদের দেশের জন্য একটা নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার কথা, জনাব ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপল্স পার্টি (পি পি পি) পায় ৮১ টি আসন (সবগুলিই পশ্চিম পাকিস্তানে) এবং আওয়ামী লীগ পায় ১৬০ টি আসন (সবগুলিই পূর্বপাকিস্তানে)। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় (৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন) পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও একটি ঢিলে বন্ধনের কনফেডারেশনের বাস্তব সমস্যা দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের পক্ষে এটা হজম করা সম্ভব ছিল না এবং সঙ্কট তরান্বিত হতে থাকে।

১৯৭১ সালে ভারতের কাছে পাকিস্তানের চরম পরাজয়ে পাকিস্তানের গোটা ইতিহাসে সেনাবাহিনীর মর্যাদা সবচে' নিম্নতম সোপানে নেমে আসে। এর ফলে ভুট্টোর পক্ষে কমপক্ষে ৪৩ জন সর্বোচ্চ জেনারেল, অ্যাডমিরাল ও এয়ার মার্শালকে পদচ্যুত করা সম্ভব হয়।[৬৫] পিপিপি-র দেয়া রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের ফলে কৃষকশ্রেণী ও শহুরে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে দাবীর পরিমাণ আরো বাড়তে থাকে। এইসব দাবী কয়েকটি অর্থনীতির মাত্র খাত জাতীয়করণ ও ভূমি সংস্কার করেই মেটানো সম্ভব ছিল না। তবে ক্ষমতাসীন পিপিপি নেতা ভুট্টো কোনো বড়রকম পদক্ষেপ নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোতে পাকিস্তানের অবস্থান কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তার ধারণা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৯৭২ সালে পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ভুট্টোর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিম্নরূপ:

"অবশ্যই দু'টি ঐক্যজোট "সেন্টো" ও "সিয়াটো" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহ বলবৎ রয়েছে। তবে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এগুলো অকার্যকর হয়ে গেছে। আমি আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন করতে চাই না। আমি এইসব প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারটি জাতীয় পরিষদের উপর ন্যস্ত করতে চাই, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের একটা অংশ এবং গোটা পূর্ব(পাকিস্তান)-টা দখল করে রয়েছে।"[৬৩]

যদিও পূর্ব-পাকিস্তান সঙ্কটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রীর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল তা ১৯৭৫ সালে তুলে নেয়া হয়, তবুও অস্ত্র-বাজারে গিয়ে বড় আকারের অস্ত্র-শস্ত্র কেনার মত তহবিল পাকিস্তানের ছিল না। তার একমাত্র ভরসা ছিল ইরান ও এ অঞ্চলে সরবরাহকৃত মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্র। ১৯৭৬ সালে ভুট্টো আরেকবার অস্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়। সামরিক সাহায্য অব্যাহত রাখার পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল ভারত-মহাসাগর সঙ্কট, এই উপমহাদেশে এবং পার্শ্ববর্তী পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এলাকায় সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি।[৬৭] ভারত কর্তৃক পারমানবিক ক্ষমতা অর্জন ও মস্কোর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনসমূহ এই সাহায্য চাওয়ার বাড়তি কারণ হিসেবে কাজ করে। ইরানে ব্যাপক ভাবে প্রতিশ্রুত থাকা এবং পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার কারণে মার্কিনীরা পাকিস্তানে কোনো সামরিক সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া থেকে মোটামুটি বিরত থাকে, তবে ইরান ও আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহের কারণে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আবার পরিবর্তন করে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের চেষ্টায় ভুট্টো দেশটাকে তৈল-সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর উপর আরো নির্ভরশীল করে ফেলে যে প্রক্রিয়াটা আসলে আইয়ুব খানের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। হাজার হাজার দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ পাকিস্তানী শ্রমিক পাকিস্তান ছেড়ে সৌদী আরব, দুবাই, আবু ধাবী কুয়েত, ইরান ইত্যাদি দেশে চলে যাওয়া শুরু করে। অন্যদিকে "ওপেক"-ও পাকিস্তানে কিছু কিছু খাতে বিনিয়োগ বাড়ায় তবে সেসব খাতকে মোটেই উন্নয়নমূলক খাত বলা চলে না। যে শ্রমশক্তি দেশের

বাইরে গেল তারা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা হোত। এছাড়া দেশের ভেতরে জীবনযাত্রায় মান যেহেতু বাড়ল না, সেইহেতু দেশীয় উৎপাদকেরা তাদের পণ্য বিক্রীর জন্য বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

ভুট্টোর পতন ও ১৯৭৭ সালে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের ফলে উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে নির্ভরশীল সম্পর্কের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য পাকিস্তানে আরো বৃদ্ধি পেল। জনগণের মধ্যে কোনো ভিত্তি না থাকায় এবং সংগঠিত ধর্মীয় (ইসলামী) মৌলবাদী দলগুলোর উপর নির্ভরশীল থাকায় এই সরকার তেল-রপ্তানীকারক ধনী মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহের উপর বর্তমানে আরো বেশী বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাছাড়া ইরান ও আফগানিস্তানের ঘটনাবলীর কারণে পাকিস্তানী সামরিক এলিটরা তাদের পশ্চিমা বন্ধুদের কাছে তাদের ক্ষমতায় থাকার যৌক্তিকতা আরো বেশী করে দেখাতে পারছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের উপর বিশ্বাস যে কমে আসছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে নিজের গুরুত্বটা বাড়াতে, পাকিস্তান, ইরানে শাহের পতন ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের সময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত তার রাষ্ট্রদূত ইয়াকুব খানকে ওয়াশিংটন থেকে সরিয়ে মস্কোতে নিয়োগ করে।' দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলের ঘটনাবলীর কারণে এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক যে নূতন পরিবর্তন ঘটে, তার মুখোমুখি হয়ে যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে কিছুটা বিভ্রান্তিতে ভোগে এবং এই সুবাদে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা পশ্চিমা দুনিয়ার কাছে এই অঞ্চলে তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। একজন পর্যবেক্ষক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, "(আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের মত) এমন একটি ঘটনাকে পাকিস্তান স্বাগতই জানিয়েছে কারণ তা তাকে যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল থেকে ব্যাপক পরিমাণ সাহায্য লাভ এবং এই অঞ্চলে তার গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"[৬৯] আর কার্টার কর্তৃক প্রতিশ্রুত পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য কর্মসূচী যখন রেগান প্রশাসন দেয়া শুরু করল তখন পাকিস্তানী শাসকদের এই আশাবাদটা পূর্ণতা পেল (অবশ্য সাহায্যের এই পরিমাণকে জেনারেল জিয়াউল হক "যৎসামান্য" বলে আখ্যায়িত করেছেন)।[৭০]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে পড়া, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পরাজয় ও ভারতের হাতে ৯০,০০০ সৈন্য বন্দী হওয়ার

(১৯৭৪ সালে ভারত তাদের মুক্তি দেয়) কারণে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে ইরান ও আফগানিস্তানের ঘটনাবলী ও ইরান-ইরাক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ভূ-রাজনৈতিক কারণে যুক্ত-রাষ্ট্র ও তেল-উৎপাদক উপসাগরীয় দেশসমূহের উপর পাকিস্তানের নির্ভর-শীল সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা দেশের ভেতরে সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করছে। ঔপনিবেশিক যুগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে বীজ জন্ম নিয়েছিল, নয়া উপনিবেশবাদী যুগে তা এক মহীরুহে পরিণত হচ্ছে। স্যার ওলেফ ক্যারো যথার্থই ব্রিটিশ সৃষ্ট এই বিষবৃক্ষের বীজটাকে চিনতে পেরেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের নতুন যুগে এটা কি রকম বীভৎস এক রূপ নেবে সেটাও যথার্থভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন।

টীকা

১. ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, "দি মিলিটারী ব্যাল্যান্স", ১৯৭৯-৮০ (লণ্ডন, ১৯৭৯), পৃ. ৭০।
২. সি. এইচ, ফিলিপ, "দি এভুলিউশন অব ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২), পৃ. ৫০৬।
৩. ঐ, পৃ. ৫০৮
৪. ঐ, পৃ. ৫১৫
৫. আগের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে ১৯০০ সালের আগে কোনো ভারতীয়কে অফিসার পদে নেওয়া হোত না। আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন, ফিলিপের প্রাগুক্ত পুস্তক, পৃ. ৫১৯-২০।
৬. ঐ, পৃ. ৫২০-১।
৭. ঐ, পৃ. ৫২৬।
৮. "ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারী কমিশন", "রিপোর্ট অব দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারী কমিশন", খণ্ড ১, (সার্ভে সিএমডি ৩৫৬৮) ("হিজ ম্যাজিস্টিজ স্টেশনারী অফিস", লণ্ডন, ১৯৩০) পৃ. ১০১।
৯. ঐ, পৃ. ১০৪।
১০. হামজা আলাভী, "দি আর্মি এণ্ড দি বুরোক্রেসী ইন পাকিস্তান", ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট জার্নাল", ইয়ার ৩, নং ১৪, মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৬, পৃ. ১৫৮।
১১. ফিলিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০।
১২. ঐ

১৩. এই তথাকথিত "সামরিক জাতির-"র তত্ত্বটি পুরোপুরিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট। উদ্দেশ্য ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও তাবে রাখা।

১৪. ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারী কমিশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৫. ঐ

১৬. আলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-৬০।

১৭. লর্ড বার্ডউড, "ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এ কন্টিনেন্ট ডিসাইড্স", (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪), পৃ. ১৫৪-৬০।

১৮. খালিদ বি. সাঈদ, "দি পলিটিক্যাল সিস্টেম অব পাকিস্তান" (হাউটন-মিফলিন কোম্পানী, বোস্টন, ১৯৬৮), পৃ. ৩০৫।

১৯. "ইউনাইটেড স্টেট্স আর্মস কন্ট্রোল এণ্ড ডিজ আর্মামেন্ট এজেন্সী" "দি কন্ট্রোল অব লোকাল কনফ্লিক্ট : এ ডিজাইন অন আর্মস কন্ট্রোল এণ্ড লিমিটেড ওয়ার দি ডেভেলপিং এরিয়াস", এসিডিএ/ডব্লিউইসি-৯৮, খণ্ড ৩, ১৯৬৭, পৃ. ২২৪।

২০. ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারী কমিশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

২১. বার্ডউড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪, ২৯১।

২২. আলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

২৩. ঐ

২৪. ফজল মুকীম খান (মেজর জেনারেল), "দি স্টোরি অব দি পাকিস্তান আর্মি" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী), পৃ. ১৫১-৪।

২৫. লিয়াকত আলী খান, "পাকিস্তান : দি হার্ট অব এশিয়া" (১৯৫০ সালের মে ও জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রদত্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ) হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ, ১৯৫০), পৃ. ১৬।

২৬. ঐ

২৭. ঐ, পৃ. ১১-১২।

২৮. ঐ পৃ. ৩৯, ৮৬।

২৯. উইলিয়াম জে, ব্রাওস, "ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড গ্রেট পাওয়ার্স" (নিউইয়র্ক, ১৯৭২), পৃ. ৮৮-৯।

৩০. ঐ, পৃ. ৪৭-৪৮।

৩১. হ্যারিসন, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪।

৩২. ঐ

৩৩. ঐ

৩৪. নিউ ইয়র্ক টাইম্স, ২রা নভেম্বর, ১৯৫৫।

৩৫. ইউ. এস. নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট, ৯ই অক্টোবর, ১৯৫৩।

৩৬. ঐ, ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৩।

৩৭. ঐ, ৩রা অক্টোবর, ১৯৫৩।

৩৮. ঐ, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৩।

৩৯. নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স, ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৩ ; ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ ; ১৭ই নভেম্বর ১৯৫৩।

৪০, হ্যারিসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৪১. উদাহরণের জন্যে দেখুন, 'মিলিটারী এসিস্ট্যান্স টু পাকিস্তান', "আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ", খণ্ড XLVIII, নং ৩, (সেপ্টেম্বর) ১৯৫৪, পৃ. ৭৩৮-৪৫ ; এবং অ্যামোস এ, জর্ডান, জুনিয়র, "দি রোল অব দি মিলিটারী ইন আণ্ডারডেভেলপ্‌ড কান্ট্রিজ" (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬২), পৃ. ৪০, ২০৮।

৪২. জুলফিকার আলী ভুট্টো, "দি মিথ অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯৬৯), পৃ. ১।

৪৩. মুনীর আহ্‌মেদ, "ফেইলার অব নেশন-বিল্ডিং ইন পাকিস্তান", "পাকিস্তান ফোরাম", খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, ১৯৭১, পৃ. ৯।

৪৪. হ্যারিসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১৭।

৪৫. ইউনাইটেড স্টেট্‌স আর্মস কন্ট্রোল এণ্ড ডিসআর্মামেন্ট এজেন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

৪৬. ফজল মুকিম খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮-৯।

৪৭. হ্যারিসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৪৮. ক্যারো, প্রাগুক্ত।

৪৯. হামজা আলাভী ও আমির খসরু, "পাকিস্তান : দি বার্ডেন অব ইউ. এস. এইড", "নিউ ইউনিভার্সিটি থট" (শরৎ), ১৯৬২, পৃ. ১৮।

৫০. জর্ডান জুনিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৫১. যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও ষ্ট্রাটেজীর প্রসঙ্গে দেখুন, মার্কিন কংগ্রেস, "হিয়ারিং বিফোর দি সাব কমিটি অন ন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসিজ এণ্ড সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট অব দি কমিটি অব ফরেন এফেয়ার্স অব হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স", ৯১তম কংগ্রেস, দ্বিতীয় অধিবেশন (মিলিটারী এসিস্ট্যান্স ট্রেনিং), গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯৭০)।

৫২. ফজল মুকীম খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৫৩. এস. ই. ফাইনার, "দি ম্যান অন হর্সব্যাক", "দি রোল অব দি মিলিটারী ইন পলিটিক্‌স" (ফ্রেডারিক এ, প্রেগার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২), পৃ. ৮২।

৫৪. নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স. ১২ই অক্টোবর, ১৯৫৮।

৫৫. আলাভী ও খসরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৪ এবং তারিক আলী, "পাকিস্তান : মিলিটারী রুল অব পিপল্‌স পাওয়ার" (উইলিয়াম মরো এণ্ড কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০), পৃ. ৮৭।

৫৬. দেখুন, লরেন্স জাইরিং, "দি আইউব খান এরা পলিটিক্স ইন পাকিস্তান" (সিরাকুজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১); হার্বার্ট ফেল্ডম্যান, "রেভুলিউশন ইন পাকিস্তান, এ স্টাডি অব দি মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেশন (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি

প্রেস, ১৯৬৭) ; শাহীদ জাভেদ বার্কী, "টুয়েন্টি ইয়ার্স অব দি সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান : এ রি-এভুলিউশন", "এশিয়ান সার্ভে", খণ্ড ৯, সংখ্যা ৪, এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ২৩৯-৫৪।

৫৭. হামজা আলাভী, "ইউ এস এইড টু পাকিস্তান : এন এভুলিউশন", "দি ইকনমিক উইকলি", বিশেষ সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৩, পৃ ১২০৯-১৬।

৫৮. "দি নিউ রিপাবলিক", ৯ই জুলাই, ১৯৬২, পৃ. ৭।

৫৯. "চায়না অন দি মার্চ", "দি নিউ রিপাবলিক", ১০ই নভেম্বর ১৯৬২, পৃ. ৩-৪।

৬০. "কাশ্মীর স্টেলমেট", "দি নিউ রিপাবলিক", ১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৩। পৃ. ৮।

৬১. স্টেফেন হু-জোন্স, "ইণ্ডিয়াস নিউ মিলিটারী স্ট্রেঙ্গথ্", "দি নিউ রিপাবলিক", ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৪, পৃ. ১২-১৩।

৬২. হ্যাঞ্জেন "পাকিস্তান এট বে", "দি নিউ রিপাবলিক", ৩০শে মার্চ, ১৯৬৩, পৃ ১৩-১৫।

৬৩. "কামিং শোডাউন ওভার আর্মস : দি ইউ এস, ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান", "দি নিউ রিপাবলিক", ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, পৃ. ১১-১২।

৬৪. দেখুন "রুট অব দি গ্রাস", "পাকিস্তান ফোরাম", খণ্ড ১, ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৭০-৭১, পৃ. ৯।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

৬৬. "দি নিউ ইয়র্ক টাইম্স", ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

৬৭. টাড জুলক, 'কনফ্রন্টেশন পলিটিক্স ইন দি ইণ্ডিয়ান ওসান", "দি নিউ রিপাবলিক", ১৩ই মার্চ, ১৯৭৬, পৃ. ২২-৪।

৬৮. মর্টন কনড্রাক, "হু লস্ট ইরান" ? "দি নিউ রিপাবলিক", ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃ. ৯-১২।

৬৯. রোনাল্ড স্টিল, "আফগানিস্তান ডাজ নট ম্যাটার", "দি নিউ রিপাবলিক", ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, পৃ. ১৪-১৫।

৭০. মশরুর হাসান, "দি ফিল্ম দ্যাট ওয়ার্কস", "ভিউপয়েন্ট", ২৮শে মে, ১৯৮১, পৃ. ১৩।